কাহিনী

শাবেন্দ ঘোষ

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

কায়াহীনের কাহিনী

ভূমিকা

অবিনাশ চাটুজ্জের বাসায় আমাদের 'রামি' খেলার আড্ডা খুব জমে উঠেছিল। আমি, অবিনাশ চাটুজ্জে, ভরত গুপ্ত ও দেবকুমার গুহ এই চারজনে মিলে প্রতি দশ পয়েন্টে এক নয়া পয়সা বাজি রেখে হোমিও-প্যাথি ডোজে জুয়া খেলার স্বাদ গ্রহণ করছিলাম। বাইরে আষাঢ়-শেষের আকাশে বেলা চারটের সূর্য মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, ফলে পটলডাঙ্গার গলিতে ছায়া একটু অকালেই গাঢ় হয়ে উঠেছিল বলে আমরা দিনের বেলাতেই আলো জ্বেলে—কিন্তু না, এসব কথা বলার আগে আমাদের পরিচয়টা সংক্ষেপে সেরে নিই।

আমি, শ্রীবিনয় বোস, একটি সরকারী দপ্তরের হেডক্লার্ক। শ্রীঅবিনাশ চাটুজ্জে 'কালান্তর' নামক একটি বাংলা দৈনিকের সাব-এডিটর। শ্রীভরত গুপ্ত উত্তর কলকাতার কোনও একটি বেসরকারী স্কুলে বাংলা ও সংস্কৃত পড়ায়। তদুপরি সে প্রতিশ্রুতিবান লেখক। যদিও তার কোনো লেখা এ যাবৎ কোনও কাগজে আমারা ছাপার অক্ষরে দেখিনি তবু আমরা তার মুখে যা শুনি তা লেখার মতই মনে হয় এবং মনে হয় যে তার মধ্যে একটি রসিক লেখক লুকোন আছে। সে যা শোনায় তা শুনে আমরা বরাবর চমৎকৃত হই এবং তাকে লিখবার জন্য ও লিখে কাগজে ছাপাবার জন্য নিষ্ফল অনুরোধ করি। চতুর্থ শ্রীদেবকুমার গুহ উকীল। এক পাড়াতেই থাকি, আমাদের সবারই বয়স চল্লিশোর্ধে এবং আমরা সবাই নিতান্তই মধ্যবিত্ত। এর বেশী পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক কারণ মূল গল্পে আমাদের কারো স্থান নেই। যে স্থানে, যেকালে ও যে পাত্রদের মধ্যে একটি গল্পের আলোচনা হয়েছিল শুধু সেটুকু বোঝাবার জন্যই যতটুকু বলা দরকার তা বললাম।

যা বলছিলাম—আমাদের 'রামি' খেলা বেশ জমে উঠেছিল। আমি ও দেবকুমার গুহ জিতছিলাম। অবিনাশ চাটুজ্জে ও ভরত গুপ্ত হারছিল। আমার জিত বিয়াল্লিশ নয়া পয়সা, দেবকুমারের সাতান্ন।

বেলা তখন চারটে, আকাশ মেঘে অন্ধকার এবং মিনিট দশেক আগে দ্বিতীয়প্রস্থ চা-পান শেষ হয়েছে।

খেলা আরো জমল। পাঁচটা বাজতে বাজতেই তৃতীয়বার চা এল, তার সঙ্গে মুড়ি আর ফুলুরি। অবিনাশ চাটুজ্জের বৌকে ধন্যবাদ।

কিন্তু তার খানিক বাদেই ভরত গুপ্ত হাতের তাস ফেলে বলল, দি এন্‌ড্‌—দেবকুমার গুহ প্রশ্ন করল, সে কি হে? এখনো তো কলির সন্ধ্যে হয়নি। ভরত গুপ্ত জবাব দিল, রসিক লোকেরা রস বিকার এড়িয়ে চলে। মাত্রাবোধ না থাকলে রসসৃষ্টি হয় না এবং রসের স্বাদও টের পাওয়া যায় না। তাছাড়া কলির সন্ধ্যে বলছ কি হে, আমার তো কলির রাতও শেষ হয়ে গেছে। বুঝলে না? আরে বাংলা আর সংস্কৃতের মাস্টারী করলে তাড়াতাড়ি কলিক্ষয় হয়।

অবিনাশ চাটুজ্জে বলল, আমারও আর ভাল লাগছিল না হে, কতক্ষণ আর হারা যায়?

আমি বললাম, আহা ধার দিচ্ছি, মন খারাপ করছ কেন ভাই?

ভরত গুপ্ত বলল, অবিনাশকে পাগল ভাবছ কেন? ও পরের ধনে পোদ্দারী করে না।

দেবকুমার গুহ হঠাৎ তক্তাপোশের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে বলল, যা বলেছ ভাই জড়ভরত।

না, ভরত গুপ্ত সম্পর্কে কিন্তু খুব সংক্ষেপে সারা যাবে না। তার বিষয়ে আরো কিছু বলতে হয়। আমাদের পাড়ায় সে এসেছে মাত্র তিন বছর আগে কিন্তু এরি মধ্যে আমরা চিনে নিয়েছি যে সে আসলে একটি রত্ন। অর্থাৎ রতনে রতন চেনে (আত্মপ্রশংসার লোভটা এড়াতে পারছি না)। অবশ্য ভরত গুপ্তকে প্রথমে দেখে কিছুই বুঝিনি আমরা। দেখতে সে আমার মত মোটা, অবিনাশের মত ঢ্যাঙা কিংবা দেবকুমারের মত দোহারা ও পেশী-সমৃদ্ধ নয়। নেহাৎই নিরীহ, রোগা ও বেঁটে মানুষটি সে। জড়সড় হয়ে থাকে সর্বত্র, কথা প্রায় বলেই না। [illegible] রংটা যদি আর একটু ফর্সা হত এবং যদি তার কপালে ও নাকে [illegible] কেটে সাজিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তাকে অনায়াসে জাতবোষ্টম

বলে নবদ্বীপের হাটে বসিয়ে দেওয়া যায়। এ হেন গোবেচারী চাকচিক্যহীন ইস্কুল মাস্টারের সঙ্গে পাড়ার দুর্গাপুজো উপলক্ষে কথা বলতে গিয়েই কিন্তু আমরা অবাক এবং মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আবিষ্কার করলাম যে মানুষের সত্যিকারের ও শেষ বিচার শুধু তার কর্ম ও চিন্তা দিয়েই সম্ভব। দেখলাম যে সে আমাদেরই মত ঘোর সংসারী, এক ভাইপো, এক বিধবা বোন ও দুই বোনপোকে নিয়ে মহা ন্যতিব্যস্ত। অবশ্য এক বছর বাদে, একটু ঘনিষ্ঠ হবার পর জানতে পারলাম যে ভাইপোটি আসলে তার কেউ নয়, পিতৃমাতৃহীন একটি অনাথ। তার বিধবা বোনটিও আসলে কেউ নয়, আশ্রিতা। তার স্বামী চার বছর আগে আত্মহত্যা করে দারিদ্র্যের হাত থেকে মুক্তি পান। দুটি অপোগণ্ড সন্তান কোলে মহিলা যখন স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করার কথা ভাবছিল তখন ভরত গুপ্ত তাকে মাথায় করে নিয়ে এসে আশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু সে ঘোর সংসারী হলেও অবিকল আমাদের মত নয়—অর্থাৎ বিবাহিত নয়। না, কথাটা বোধ হয় ঠিক বলা হল না—আসলে আমরা ধরে নিয়েছি যে সে অবিবাহিত কারণ সে যে বিবাহিত তা এখনো সঠিক জানতে পারিনি। অর্থাৎ জানবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। ঠিকমত জবাব দেয়নি সে। মনে হয় কোনো বেদনাদায়ক রহস্য আছে ওই ব্যাপারে। তার অতীত জীবনও আমরা ধারাবাহিকভাবে জানতে পারিনি। সে এড়িয়ে গেছে। কিন্তু তার অনেক কথা না জেনেও এইটুকু বুঝেছি যে সে সাধারণের কাছে জড়সড় হয়ে থাকলেও ইস্কুলে একজন ভাল শিক্ষক এবং আমাদের কাছে আগুনে-পোড়ানো সোনা, রসিক, দার্শনিক এবং বন্ধু। তাই ভালবেসেই আমরা তাকে মাঝে মাঝে জড়ভরত বলে ডাকি।

অবিনাশ চাটুজ্জে হেসে বলল, অনেকদিন সিনেমা দেখা হয়নি যে—যাবে নাকি?

দেবকুমার গুহ বলল, মন্দ নয় প্রস্তাবটি, কি বল বিনয়?

আমি বললাম, প্রস্তাবটি সমর্থনযোগ্য, বহুদিন বাস্তব জগৎ থেকে পলায়ন করিনি।

অবিনাশ চাটুজ্জে বলল, চল তাহলে 'ঝিন্দের বন্দী' দেখে আসি।

কিন্তু হায়, তখুনি বৃষ্টি নামল। আকাশ ভেঙ্গে। পটলডাঙ্গার পুরোন বাড়ীগুলোর হাড় কাঁপিয়ে মেঘ ডাকল, তাদের ছাৎলা-ধরা নোনা দেয়ালের ওপর বিদ্যুতের আলো প্রতিহত হল।

আমি সখেদে বললাম, নাও, সিনেমা দেখার প্ল্যান ভেসে গেল।

দেবকুমার গুহ বলল, তা কেন? প্রকৃতি চিরকাল মানুষকে বাধা দিচ্ছে বলে কি মানুষ বসে আছে? না হয় একটা ট্যাক্সি করে—

অবিনাশ চাটুজ্জে বাধা দিয়ে বলল, হ্যাঃ, ট্যাক্সি তোমার দোরে বাঁধা আছে কিনা। তাছাড়া সেই অঘটন ঘটলেও এই বিষ্টি ঠেলে গিয়ে যদি টিকিট না পাই? আজ রবিবার—

ভরত গুপ্ত বলল, অতএব থাক এই সিনেমা দেখা—

দেবকুমার গুহ ফুট কাটল, তোমার মত বেরসিক দেখিনি কখনো।

ভরত গুপ্ত বলল, আহা রেগো না। সমাজ-সংসারকে মিছে মনে হয় এমন বৃষ্টি নেমেছে, এ সময়ে তোমাদের অন্তঃপুরে বিচরণ করাই ভাল। তা নয় জলে-কাদায় কোথায় যাবে হে? এ্যনথনি হোপ তথা সরদিন্দু বাঁড়ুজ্জের 'ঝিন্দের বন্দী' কালও থাকবে।

আমি বললাম, ভরত গুপ্তের কথা ঠিকই। তাছাড়া সেই তো জানা গল্প ভাই—এক চেহারার দুটি লোক। জন্মে অবধি সেই একই গল্প শুনছি। শেকস্-পীয়রের 'কমেডি অফ এররস', 'প্রিজনার অফ জেণ্ডা', 'কর্সিকান ব্রাদার্স', 'রত্নদ্বীপ', 'কালোছায়া', 'স্মৃতিটুকু থাক', 'তাসের ঘর'—তাছাড়া হলিউড, বোম্বাই ও মাদ্রাজ থেকে বছরে একটা দুটো তো আছেই।

অবিনাশ চাটুজ্জে সায় দিয়ে বলল, তা ঠিক।

ভরত গুপ্ত বলল, তা কিন্তু ঠিক নয় ভাই বিনয় বোস ও অবিনাশ চাটুজ্জে।

রসের তারতম্য আছে প্রতিটি গল্পের—ধর লাল রং—তার কি [illegible] 'শেড' হয় না? জন্মে অবধি আমাদের বাপপিতামহরা [illegible]

কিছুই দেখেছেন, চেখেছেন ও জেনেছেন তবু কি আমাদের কাছে তা পুরোন হয়েছে? তাছাড়া গল্প আর নাটকের বিষয়বস্তু তো হাতে গোনা যায় হে। নিরুদিষ্ট ছেলে আবার ফিরে এল, দায়ে পড়ে নিরীহ লোক অপরাধী হল, একটি স্বামী বিপথে গিয়েও স্ত্রীর ভালবাসার টানে ফিরে এল—এমনি নানা গল্প আছে বটে কিন্তু সব শুনলে হয়ত তিরিশ চল্লিশটির বেশি হবে না। আসলে সেডের পার্থক্য। শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত জানা থাকলে যেমন সংখ্যাতীত সংখ্যা তৈরি করা যায়—রসের ব্যাপারেও ঠিক তেমনি।

দেবকুমার গুহ আবার উঠে বসল, একটু সন্দিগ্ধ ভঙ্গীতে বলল, আহা, কী বলতে চাইছ তুমি?

ভরত গুপ্ত হাসল, বলল, বলতে চাইচি রসের কথা। একই গল্প স্থানকালপাত্রের ভেদাভেদে পৃথক ও সতন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। তোমরা একই চেহারার দুটি পুরুষ বা দুটি নারীর অনেক গল্পের কথাই পড়েছ, শুনেছ কিংবা সিনেমায় দেখেছ। কিন্তু সব গল্পই কি এক স্বাদ বয়ে এনেছে? আমি একটা গল্প জানি—এক চেহারার দুটি লোকের ব্যাপার কিন্তু একেবারে আলাদা তার স্বাদ।

অবিনাশ চাটুজ্জে উৎসুক হয়ে উঠল, কি গল্প হে জড়ভরত?

—একটি সত্যি গল্প।

—তোমার নিজের অভিজ্ঞতা?

—না, আমার এক বন্ধুর অভিজ্ঞতা। তার সঙ্গে বছর দশেক আর দেখা হয় নি, বোধহয় এখন আর কলকাতায় নেই।

দেবকুমার গুহ চটে উঠল, আচ্ছা ভনিতা করছো তো! আরে সেই ভদ্রলোক এখন কলকাতায় থাকলে কি গল্প অন্যরকম হত?

ভরত গুপ্ত হাসল, বলল, চটো না উকীল মহোদয়. তোমার কথার অর্থ আমি বুঝতে পেরেছি এবার গল্প শুরু করছি।

আমি ও অবিনাশ চাটুজ্জে একসঙ্গে বললাম, সাধু সাধু—

গল্পারম্ভের ভূমিকা

ভরত গুপ্ত সহাস্যে বলতে শুরু করল ঃ

সে প্রায় উনিশশো চল্লিশের কথা। তখন তোদের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। আমি বি-এ পাশ করলাম। আমার তখন এক বন্ধু ছিল তার নাম শান্তনু রায়। নামের মতই রোম্যান্টিক ছিল তার চেহারা। দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, ব্যায়ামপুষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। আমার সঙ্গেই পাটনা থেকে বি-এ পাশ করে সে বেকারের লিস্টে নাম লেখাল। আমি এম-এ পড়তে থাকলাম, শান্তনু কলকাতায় এক দূর সম্পর্কের কাকার বাড়ীতে থেকে ভাগ্যের চাকা ঘোরাবার জন্য দপ্তরে দপ্তরে ঘুরতে লাগল। তারপর প্রায় সাত বছর বাদে, উনিশশো সাতচল্লিশে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, তার সঙ্গে আমার আবার দেখা হল। এই কলকাতা শহরেই। আমিও তখন ভেসে এসেছি এখানে। উদ্দেশ্য সংবাদপত্রসেবী হওয়া। শান্তনুর সঙ্গে নাটকীয় ভাবেই হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। শ্যামবাজারের মোড়ে। প্রথমটায় আমি তাকে চিনতে পারিনি। একে সাহেবী পোশাক, তায় একমুখ শৌখীন দাড়িগোঁফ। সে-ই প্রথমে আমায় চিনল।

আমায় দেখে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে, তারপর সোজা আমার কাছে এসে কাঁধে হাত রেখে শান্তনু বলল, কিরে, চিনতে পারিস ?

আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম, কে ? আপনি—আপনাকে তো—

শান্তনু আপত্তিকর একটি নামে আমায় সম্ভাষণ করে বলল, মারব মাথায় এক গাট্টা—বল্ আমি কে ?

'গাট্টা মারব' বলতেই চিনে ফেললাম তাকে। কথায় কথায় 'গাট্টা মারব' একমাত্র শান্তনুই বলত।

আমিও সোল্লাসে তাকে একটি গাল দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে শান্তনু আমায় টেনে নিয়ে চলল তার হোটেলের দিকে।

হোটেলটি ভালই, অর্থাৎ শান্তনুর অবস্থাও ভাল মনে হল। সে একটি জার্মান মেডিক্যাল ফার্মের প্রতিনিধি। ছ'শ টাকা মাইনে তা

ছাড়া এলাউন্স ইত্যাদি তো আছেই।

চায়ের সঙ্গে প্রচুর সিঙ্গাড়া পেস্ট্রি খাইয়ে সে আমায় এ্যামেরিক্যান সিগারেট ধরিয়ে দিল। জিগ্যেস করলাম, বিয়ে করেছিস?

শান্তনু জবাব দিল, আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে তারে আর খুঁজে পাব না বন্ধু অর্থাৎ পেয়ে হারিয়েছি সেই রমণীকে—

আমি প্রশ্ন করলাম, লেখাটেখা এখনো মক্স করিস বুঝি?

—কেন?

—নইলে এমন সাহিত্যিক ভাষায় ব্যর্থ প্রেমের ইঙ্গিত করতিস্ না।

শান্তনু হেসে বলল, না ভাই, আজকাল আর সাহিত্য-চর্চা করি না। পাঁচ বছর আগে হঠাৎ একদিন মনে হল যে লিখতে গেলে যে সহিষ্ণুতার দরকার তা তোর মত আমার নেই—

—হুঁ—তুই বেশ স্মার্ট হয়ে গেছিস শান্তনু—তোর মধ্যেকার সেই লাজুক মানুষটি বেমালুম অন্তর্ধান করেছে।

শান্তনু সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, জীবন আমার লজ্জা হরণ করেছে ভরত।

—বটে? আর জীবনের জন্যই বুঝি এই দাড়ি গজিয়েছে?

শান্তনু যেন একবার চমকে উঠল, পূর্ণদৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, ঠিক বলেছিস ভরত। জীবনই বাধ্য করেছে আমায় দাড়ি রাখতে।

—তার মানে? ডাকাতি করেছিলি নাকি? কিম্বা কোন কুমারীর—

শান্তনু বাধা দিয়ে বলল, অত সরল ব্যাপার নয় ভরত, সে এক উদ্ভট গল্প—একাধারে 'মিস্ট্রি' ও 'গোস্ট্ স্টোরি'—

আমি উৎসুক হয়ে বললাম সেকিরে! বল দেখি শুনি—দেখি কোন গল্পের মশলা পাই কিনা!

শান্তনু বলল, গল্প নিশ্চয়ই পাব কিন্তু উপন্যাসের খোরাকি পাবি কিনা সন্দেহ আছে. বড় গল্পের চেয়ে বড় হতে দিই নি আমি। কিংবা

বলব ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তিনি সময়মত আমার মনে পালাবার সদ্‌বুদ্ধি দিয়েছিলেন কিংবা মল্লিকা—

—মল্লিকা কে ?

—একটি মেয়ে।

—তোর ভূমিকা কিন্তু বড় বেশী বিলম্বিত হয়ে যাচ্ছে শান্তনু !

শান্তনু বলল, দেখ, তোদের সাহিত্যিকদের কিছু কিছু প্যাঁচ এখনো আমার মাথায় আছে। ভূমিকা শোনাতে শোনাতে শ্রোতাকে অধৈর্য করে তুলেছি অর্থাৎ কৌতূহল সৃষ্টি করেছি।

কিন্তু সাহিত্যের ব্যাকরণ বলে যে ভূমিকারও একটা সীমা আছে।

—জানি। ব্যাকরণের সেই ম্যাকমোহন লাইন আমি চিনেদের মত অতিক্রম করিনি ভরত—এই নে গল্প শুরু করে দিলাম।

পাল্প

॥ এক ॥

শান্তনু বলতে শুরু করল :

সাত বছর হল, কি বলিস ? সেই যে পাটনা থেকে বাবার মাসতুতো ভাইয়ের এখানে এলাম ? ছোটবেলায় মা মারা গিয়েছিলেন। পাটনা ছেড়ে আসার আগেই ছোট বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল সে খবরও তো জানিস। পাটনাতে আমার গরীব বাবার দেখাশোনা করার জন্য রইলেন বিধবা পিসিমা। আর বাঙ্গালী বিহারী ঝগড়ার নমুনা দেখে, আমি কলকাতার টিকিট কেটে ভাগ্যান্বেষণে কেটে পড়লাম। কিন্তু বাবাব মাসতুতো ভাইয়ের বাড়ীতে টেঁকা মুশকিল হয়ে উঠল। মুখ বুজে তাদের ফাইফরমাস্ খাটতে খাটতে একটা শর্টহ্যাণ্ড টাইপরাইটিং এর স্কুলে ভর্তি হয়ে খুব তাড়াতাড়ি বিদ্যাটাকে আয়ত্ব করে ফেললাম। এক বছর বাদে টাইপিং এর স্পীড দেখে স্কুলের মালিক ও প্রিন্সিপ্যাল আমায় তিরিশ টাকা মাইনে দিতে শুরু করল টাইপিং শেখানোর জন্য। তখন মরীয়া হয়ে দু'বেলা দুটো টিউশনিও করতে শুরু করলাম। সব মিলিয়ে মাসে প্রায় নব্বই একশ' টাকা রোজগার হতে লাগল। তদুপরি বাবা কুড়ি টাকা করে পাঠাতেন। একমাত্র ছেলের বিষয়ে তাঁর মনে সব সময়েই দুশ্চিন্তা ছিল। শিক্ষকতা ও টিউশনি করে মোটামুটি যখন স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছি তখন বাবার মাসতুতো ভাই একটু বাড়াবাড়ি শুরু করলেন। বিশেষত তাঁর স্ত্রী পুত্রেরা। অগত্যা সেখান থেকে একদিন সম্পর্ক কাটিয়ে কেটে পড়লাম। উঠলাম গিয়ে ভবানীপুরের এক গলিতে। সুবোধ মুখার্জী নামক এক আফিংখোর ও নিষ্কর্মা লোকের একটি নির্বোধ ও দুরন্ত ছেলেকে পড়াবার ভার নিয়ে তাঁরই বাড়ীর নীচের তলায় বাইরের একটি ঘর চোদ্দ [illegible] ভাড়া নিলাম। দিনের বেলা বাইরে থাকতাম, রাতে নিজে [illegible] ভাত চাপাতাম। কিছুদিন বাদে টাইপিং স্কুলের পিয়ন যতীন আমার সঙ্গে থাকা শুরু করল। সে দু'বেলাই আমার কাজ ও রান্না করে

দিত ও দুপুরে আমার-ই সঙ্গে অফিস যেত। মাইনে সে এক পয়সাও নেবে না, শুধু দু'বেলা দুটি খাবে। আমি হিসেব করে দেখলাম যে তাতে আমার পনেরো টাকা বাড়তি খরচ। গায়ে লাগল না। যতীন আসার পর হঠাৎ ভাবলাম যে এবার একটু সাহিত্য-সাধনার চেষ্টা করব। লাইব্রেরী থেকে বই আনা শুরু করলাম, লেখাও মক্স করতে আরম্ভ করলাম। ভাবলাম হবে একটা কিছু। তখন সাহিত্যে রম্য-রচনার যুগ শুরু হয়েছে। ভাবলাম হয় মনগড়া ভ্রমণকাহিনী, কিংবা রম্য-রচনা কিংবা পরকিয়া তত্ত্ব নিয়ে বাজার মাৎ করে দেব। জীবনে তখনো অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ঘটেনি অথচ লেখক হতে চাই। সুতরাং পড়াশোনা শুরু করলাম আর নতুন বই কেনার সামর্থ্য নেই বলে পুরোন বইয়ের দোকানে হাঁটাহাঁটি শুরু করলাম। অর্থাৎ কলেজ স্কোয়ার। ফুটপাথে, কিংবা নিবারণ দাশের 'ওল্ড বুক শপে'। ক্রমে তা আমার নেশায় দাঁড়াল। পুরোন বইয়ের জগৎ আমায় চিনে ফেলল। পকেটে পয়সা না থাকলেও আমি গিয়ে সেখানে ঘুরতাম, নিবারণ দাশের দোকানে বসে পুরোন বইয়ের পুরোন গন্ধের মধ্যে বসে ইতিহাস, দর্শন আর মনস্তত্ত্বের বই নিয়ে সন্তর্পণে পাতা ওলটাতাম আর শরৎচন্দ্র কিংবা তারাশঙ্করের মত একজন মস্তবড় লেখক হবার জন্য গল্পের প্লট ভাবতাম। তখন কি জানতাম যে আমিই এক গল্পের নায়ক হতে চলেছি। তখন কি জানতাম ভরত যে পৃথিবীতে এমন সব ঘটনাও ঘটে যা কল্পনার বাইরে, তখন কি জানতাম যে এই দৃশ্যগোচর পৃথিবীর সঙ্গে আরো এক পৃথিবী জড়িয়ে আছে যা অদৃশ্য। কিন্তু তোর হয়তো হেঁয়ালি মনে হবে তাই গল্পেই আবার ফিরে যাই।

সেটা বর্ষাকাল। শ্রাবণ মাস হবে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল তবু ফুটপাথে ভীড়। পুরোন বইয়ের মেলা জমজমাট। সেখানে দাঁড়িয়ে বই দেখছিলাম, হঠাৎ পেছনে ঘ্যাচ করে একটা মোটর থামার শব্দ হল। সেই শব্দের টানে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম যে একটি মস্ত বড় ইম্পালা গাড়ী দাঁড়িয়ে পড়েছে এবং তার ভেতরে একজন অভিজাত প্রৌঢ়া মহিলা বসে আছেন। আমি একবার তাকিয়েই মুখ

ফিরিয়ে নিলাম।

খানিক বাদেই ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়তে শুরু হল। আমি নিবারণ দাশের দোকানে গিয়ে উঠলাম। দাশমশাই তাকিয়ে হাসলেন, বললেন, "আপনি চা খেলে আমিও খাই শান্তনুবাবু।"

আমি বললাম, "আপনি রসিক লোক নিবারণবাবু।"

দাশমশাই বললেন, "নইলে কি আর পুরোন বইয়ের ব্যবসা করতাম—ওরে নেপাল—"

চা এল। চা খেতে খেতে একটা পুরোন বইয়ের পাতায় নিবিষ্ট হতে হতে মনে হল কে যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমায় দেখছে। আমি ঘুরে গলির দিকে তাকালাম। তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম যে সেই ইম্পালা গাড়ীটা ঠিক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিঃশব্দপদ শ্বাপদের মত কখন যে সেটা এসেচে তা টেরও পাইনি। আর তার ভেতরে সেই প্রৌঢ়া মহিলা। শাদা সিল্কের শাড়ী তার পরনে, দু' কানে বোধ হয় হীরা জ্বলছে, গলায় মোটা সোনার চেন। সৌম্য ও সম্ভ্রান্ত চেহারা। কিন্তু কী আশ্চর্য, মহিলা আমার দিকে তাকিয়ে কেন! আমি উঠে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে মহিলা ড্রাইভারকে বললেন, "গাড়ী চালাও পরেশ।"

হুস্ করে গাড়ীটা চলে গেল। ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। মহিলা কেন আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন? আমার দিকেই কি? নইলে গাড়ীটা কলেজ স্ট্রীট থেকে আবার এই গলিতে এসেছিল কেন? ব্যাপারটা কি? ভাবলাম নিবারণবাবুকে বলি কথাটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত চেপে গেলাম। শুনে হয়ত হাসবেন তিনি।

কিন্তু পরদিন সন্ধ্যেবেলা তাঁর দোকানে যেতেই তিনি সহাস্যে বললেন, "বিয়ে থা তো করেন নি মশাই, তাই না?"

আমি বুঝলাম না, বললাম, "না, কিন্তু একথা কেন জিজ্ঞেস করছেন?"

"মানে আমি ব্যাপারটা বুঝতে চাইছি।"

"কি ব্যাপার?"

"কাল আপনি চলে যাবার আধ ঘণ্টা পরে, আমি যখন দোকান বন্ধ করার জন্য উঠেছি এমন সময়ে একটি মস্ত গাড়ী চেপে একজন বয়স্কা ভদ্রমহিলা এসে আপনার বিষয়ে খোঁজ করছিলেন। 'সেই যে চা খাচ্ছিল একটি ছেলে, লম্বামত, সুন্দর, বয়স চব্বিশ পঁচিশ হবে?' আমি বুঝলাম যে আপনার কথা বলছেন। বললাম আপনার নাম ধামের কথা। জিজ্ঞেস করলাম, কেন আপনার বিষয়ে জানতে চাইছেন তিনি। মহিলা বললেন, 'না, চেনা চেনা মনে হচ্ছিল, তাই।' তারপরে তিনি নিজেই বললেন, কিন্তু চেনা নয়। আমার ভুল হয়েছে।' তবু তিনি আপনার অফিসের ঠিকানাটা কিন্তু নিতে ভোলেননি। তাই মনে হচ্ছে যে কোন রাজকুমারীর পাত্রের সন্ধানে বোধ হয় মহিলা একালের রাজহস্তীতে চড়ে বেরিয়েছেন।"

আমি বললাম, "আপনি আমার ঠিকানাটা দিয়ে অন্যায় করেছেন দাশমশাই।"

নিবারণ দাশ বললেন, "আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই—এতে ভয় পাবার কি আছে। দেখুন না, হয়ত অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা আপনার কপালে আছে। আমি ঠেকাতে চাইলেই কি তা ঠেকবে?"

হাসিঠাট্টায় কথাটার সেখানেই ইতি হল বটে কিন্তু মনের মধ্যে কথাটা শেকড় ছড়াতে শুরু করল। সেদিন বাসায় ফিরে অনেক রাত অবধি ভাবলাম কথাটা। স্বপ্ন দেখলাম যে আমি শ্বেতহস্তীর পিঠে চড়ে কোথাও যাচ্ছি, আমার মাথার ওপর রাজছত্র, আমার পেছনে একজন পরিচারক শাদা চামর দোলাচ্ছে। সকালে উঠে মেঘমুক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে হাসলাম স্বপ্নের কথা ভেবে তারপর ভুলে গেলাম। যথা সময়ে আমার টিউশান-পর্ব সেরে যতীনকে নিয়ে টাইপিং স্কুলে হাজির হলাম।

বিকেলের দিকে, বেলা তিনটে নাগাদ একটু জিরোচ্ছিলাম। তখন সবে সিগারেট খেতে শুরু করেছি। একটা কাঁচি সিগারেট ধরিয়ে আয়েশ করে টানছি এমন সময়ে চমকে উঠলাম। সেই প্রৌঢ়া মহিলা স্কুলের মালিক মিঃ পালের ঘরে ঢুকলেন। [illegible]

একটি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গেলেন। অস্বস্তিতে ঘেমে উঠলাম, সিগারেটের ধোঁয়া গলায় আটকে যাওয়ায় কাশতে শুরু করলাম।

মিনিট পনেরো বাদে মহিলা নিষ্ক্রান্ত হলেন ও পূর্ববৎ আমার ওপর একটি কৌতূহলী নজর বুলিয়ে অন্তর্ধান করলেন। জানালার দিকে তাকিয়ে তাঁর ইম্পালা গাড়ীকে উড়ন্ত রাজহংসের মত ছুটে যেতে দেখলাম। যতীন এসে সেই সময়ে খবর দিল যে মিঃ পাল আমাকে ডাকছেন।

মিঃ পাল বললেন, "একজন মহিলা আপনার খোঁজ নিচ্ছিলেন—কোথায় থাকেন ইত্যাদি। দেখা হয়েছে?"

বললাম, "দেখেছি কিন্তু আমি তো ওকে চিনি না। আপনি কি আমার বাসার ঠিকানা বলেছেন?"

"হ্যাঁ বলেছি—কেন, বলা উচিত ছিল না বুঝি?"

"আজ্ঞে না—এমনি জিজ্ঞেস করছি।"

"ওঃ—আর এই নিন একটা ইংরিজী কবিতার পাণ্ডুলিপি—ভদ্রমহিলা টাইপ করতে দিয়ে গেছেন। পরশু দিতে হবে। টাকাও আগাম দিয়ে গেছেন। খুবই বড়লোক মনে হল, আশ্চর্য, আপনি চেনেন না অথচ আপনার ঠিকানা জেনে নিলেন!"

"তাইতো!" বলে আমি বেরিয়ে এলাম। মিঃ পালের প্রশ্ন তো আমিও করছি। রহস্যময় মনে হচ্ছে সব কিছু। কে মহিলা? আমি তাঁর চেনা লোক মনে হলেও চেনা যে নই তা তো তিনি গতকালই স্বীকার করেছেন—তবু

শেষ পর্যন্ত ভাবনা ছেড়ে দিলাম। কলকাতা শহরে নানা অদ্ভুত পুরুষ ও স্ত্রীলোক আছেন, ভদ্রমহিলা তাদেরই একজন। নিশ্চয় মাথার গোলমাল আছে।

অফিস থেকে বেরিয়ে কলেজ স্ট্রীট ঘুরে ওপাড়াতেই একটা [illegible] ঠেঙিয়ে বাসায় ফিরেই আবার এক ধাক্কা খেলাম।

যতীন বলল, "একজন মাঝবয়সী মেয়েলোক এসেছিলেন—এত বড় এক গাড়ী চড়ে বাবু—

"তা কি হয়েছে ?"

"আপনার খোঁজ করছিলেন—পাটনার। আমি ঠিকানা বলে দিয়েছি একটা চিঠি দেখে।"

"কেন ? কে তোমায় মোড়লি করতে বলেছিল ?" আমি প্রায় খেঁকিয়ে উঠলাম।

যতীন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। তার মুখ দেখে পরমুহূর্তেই আবার মায়া হতে লাগল, বললাম, "ঠিক আছে, যা হবার হয়েছে, ভাত বেড়ে দাও—"

রাতের বেলা পড়াশোনা মাথায় উঠল। বারবার মনে প্রশ্ন জাগতে লাগল—কেন ? ঐ ধনী ভদ্রমহিলা কেন আমার এত খোঁজ নিচ্ছেন ? কি উদ্দেশ্য তাঁর ? কিন্তু প্রশ্নের উত্তর ঠিক কর'ত পারলাম না। নিবারণ দাশের ভাষ্যও কেমন যেন অন্তরের সায় পেল না। নিশ্চয়ই অন্য কিছু কারণ আছে। কিন্তু তা কী ?

তার পরদিন কিন্তু সেই প্রৌঢ়া আর আমাদের টাইপিং স্কুলে এলেন না। তারও পরের দিন তাঁর দেওয়া সেই কবিতার পাণ্ডুলিপি ফেরৎ নিয়ে যাবার কথা ছিল। সেদিনও কিন্তু তিনি এলেন না। তারপর আরো দু'দিন কেটে গেল তবু তাঁর দেখা পেলাম না। শুধু একদিন বিকেলে একটি পিয়ন-মত লোক এসে ভদ্রমহিলার চিঠি দিয়ে সেই পাণ্ডুলিপি ও তার টাইপ-করা কপি নিয়ে গেল। ভাবলাম বাঁচা গেল।

কিন্তু ভাবতে না ভাবতেই বাড়ী ফিরে আবার এক ধাক্কা খেলাম। বাবার চিঠি এসেছে, তিনি লিখেছেন যে জনৈক ভদ্রমহিলা তাঁর সঙ্গে দেখা করে নাকি আমার খোঁজ করেছিলেন দু'দিন আগে। তিনি নাকি আমায় চেনেন, তাঁর নাম মিসেস মজুমদার। চিঠি পড়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। ভদ্রমহিলা তাহলে এর মধ্যে পাটনা পর্যন্ত ধাওয়া করেছিলেন ! আশ্চর্য। কিন্তু কেন ? বাবা তো কিছু লেখেন নি দেখছি। তার মানে বিয়ের প্রস্তাব করা নয়, অন্য কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য

আছে। কিন্তু কী সে উদ্দেশ্য? ব্যাপারটা এমন রহস্যময় মনে হতে লাগল যে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। আমি স্থির করলাম যে পরদিনই আমি ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করে সরাসরি জিজ্ঞেস করব যে কেন তিনি গোয়েন্দাদের মত আমার পেছনে লেগেছেন? কিন্তু দেখা করব কি করে? সেই রাজহস্তী-সদৃশ ইম্পালার নম্বর তো আমার মনে পড়ছে না! মনটা খারাপ হয়ে গেল। সে রাতেও ঘুম ভালো হল না। আমি সারা রাত ধরে নানা স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম দুটো চোখ যেন আমায় লক্ষ্য করছে। হঠাৎ সেই চোখের তারা দুটো মোটরের সার্চলাইটের মত আমার দিকে সবেগে ছুটে আসতে লাগল। আমি বাঁচবার জন্য দৌড়োতে শুরু করলাম। তবু সেই সার্চলাইট দুটো আমায় ধরি-ধরি করে যেন আমার পশ্চাদ্ধাবন করতে লাগল। দৌড়তে দৌড়তে হঠাৎ আমি থমকে দাঁড়ালাম। দেখলাম আমার সামনে সেই প্রৌঢ়া মহিলা। তিনি যেন রাস্তার মাঝখানে হাঁটু পর্যন্ত দু'পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আর আমাকে সকৌতুকে লক্ষ্য করছেন। তাঁকে দেখে থামতে না থামতেই যেন সেই সার্চলাইট দুটো থেমে গেল, সজোরে ব্রেক কষার শব্দ হল। পেছন ফিরে আমি দেখলাম, যে থামতে থামতেও সেই ভদ্রমহিলার ইম্পালা গাড়ীটা যেন আমার গায়ের ওপর এসে পড়ল। আমি চীৎকার করে পেছু হটার জন্য লাফ দিতে যেতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল আর একটা কাকের কর্কশ ডাক আমার কানে ভেসে এল। ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম যে ভোর হয়ে গেছে

হাঁক দিলাম, "যতীন, চা হল?"

"আজ্ঞে হল বলে।"

চা খেয়ে চোখ মুখ ধুয়ে সুবোধ মুখার্জীর উপযুক্ত ছেলেটিকে পড়াবার জন্য যখন বেরোব বেরোব ভাবছি এমন সময়ে যেন ভূত দেখলাম। দরজার গোড়ায় সেই প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা। মিসেস মজুমদার তাঁর পেছনে পরেশ নামক সেই ড্রাইভার। অর্থাৎ ইম্পালাও এসেছে আমি ভাবতে লাগলাম যে স্বপ্ন কি আমার শেষ হয়নি!

মিসেস মজুমদারের গলা [illegible]

"শান্তনু, তোমার সঙ্গে আমার একটি কথা আছে।"

আমি তাকিয়েই রইলাম, আমার মুখে কোন কথা জোগাল না।

"তুমি নিশ্চয়ই আমায় দেখে অবাক হচ্ছ, হয়ত বিরক্তও হচ্ছ—"

এতক্ষণে আমার জিভ নড়ল, আমি একটু রুক্ষভাবেই বললাম, "ব্যাপার কি বলুন দেখি? ক'দিন ধরে আপনি কোন উদ্দেশ্যে আমার পেছু নিয়েছেন?"

মিসেস মজুমদারের মুখে একটা অপরাধিনীর ভাব ফুটে উঠল, তিনি মৃদুকণ্ঠে বললেন, "তোমার রাগ করার অধিকার আছে বাবা—কিন্তু কেন তোমার পেছু নিয়েছি সেই কথাই তোমাকে বলতে চাই। সেই জন্যেই এসেছি।"

হঠাৎ একটু লজ্জা হল। হাজার হোক একজন ভদ্রমহিলা, আমার মায়ের বয়সী, দেখে সম্ভ্রান্ত ঘরের বলেই মনে হচ্ছে এবং তিনি আমার বাসায় এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে আর আমি কিনা—

দ্রুতকণ্ঠে বললাম, "আমার কথায় ক্ষুণ্ণ হবেন না—দয়া করে বসুন।"

মিসেস মজুমদার বললেন, "না বাবা আমি বসব না, এখানেই তোমাকে আমার কৈফিয়ৎ ও কথা বলতে পারব না। আমি এসেছিলাম তোমায় নেমন্তন্ন করতে। আমাদের বাড়ীতে তুমি যদি আজ সন্ধ্যার পর আসো তাহলে খুব খুশী হব এবং সেখানেই তোমাকে সব কথা বলব।"

আমি বললাম, "কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় আমি যে একটি ছেলেকে পড়াই—"

"আজ না হয় না পড়ালে—কষ্ট করে একবার আমাদের বাড়ীতে পায়ের ধুলো—"

মহিলার কণ্ঠে কাতরতা ছিল, আমি বাধা দিয়ে বললাম, "ছি ছি ও ভাবে বলবেন না। বেশ আমি যাব ছটার সময়, কিন্তু ঠিকানাটা?"

"উডবার্ণ পার্কের কাছাকাছি—আমি কোথায় তোমায় জন্য গাড়ী পাঠিয়ে দেব বল।"

"আজ্ঞে গাড়ীর কোন দরকার হবে না—আমি—"

"কিন্তু গাড়ী পাঠানো যে আমার দরকার বাবা—তোমার কষ্ট করার যে কোনো হেতু নেই। বল—"

"আমাদের টাইপিং স্কুলেই তাহলে পাঠাবেন—পাঁচটার সময়।"

"তাহলে এখন আসি—আমার ওপর কোনো রাগ কিন্তু পুষে রেখো না বাবা—আমি বড় দুঃখিনী।"

মহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে এতক্ষণে আমি আবিষ্কার করলাম যে তাঁর আভিজাত্য-মণ্ডিত মুখের ওপর মমতা-মেশানো একটি কমনীয়তা আছে, মাতৃত্বের প্রলেপ আছে। তাঁর কণ্ঠস্বরেও যেন সুগভীর এক বেদনার আভাস পেলাম আমি, এবং বিচলিত বোধ করলাম।

বললাম, "আমায় লজ্জা দেবেন না—আমি আপনার ওপর রাগ করিনি!"

"নিশ্চিন্ত হলাম বাবা—তাহলে ওই কথাই রইল, গাড়ী ঠিক পাঁচটার সময় যাবে!"

মিসেস মজুমদার চলে গেলেন। তাঁর যাওয়ার সময় লক্ষ্য করলাম যে ড্রাইভার পরেশও এতক্ষণ আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। কী আছে আমার মধ্যে! যাক্, মাত্র আর কয়েক ঘণ্টার তো ব্যবধান। তার পরেই তো সব রহস্যের শেষ হবে।

ওঁরা যেতেই যতীন বলল, "কি ব্যাপার বাবু? আপনার কোন আত্মীয়া বুঝি উনি?"

"না।"

"তবে?"

"আমার কেউ নন—এরপরে আর কিছু জিজ্ঞেস কোরো না আমায়—আমিও ভাবছি ব্যাপার কি?"

যতীন একগাল হেসে বলল, "বোধ হয় ঘরজামাই করতে চা: আপনাকে।"

"তোমার মাথা—খবর্দার এসব আজেবাজে কথা আর বলবে না।"

যতীন মিইয়ে গেল।

সেদিন সকালে বাড়ীওলা অর্থাৎ আফিংখোর সুবোধ মুখার্জী আমায় খুব খাতির করলেন, মায় তাঁর অপদার্থ বংশধরটি পর্যন্ত। ইম্পালার মহিমা টের পেয়ে চমৎকৃত হলাম।

টাইপিং স্কুলে সেদিন সময়কে খুব মন্থর মনে হতে লাগল। ঘড়ির কাঁটাগুলো এক মিনিট থেকে আর এক মিনিটে যেতে যেন একঘণ্টা সময় নিচ্ছে। আমি ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলাম। কখন পাঁচটা বাজবে? কখন গাড়ী আসবে? কখন রহস্যের পর্দাটা সরে যাবে? সময় কাটছে না কেন?

কিন্তু সময় শেষ পর্যন্ত কেটে গেল। ঘড়ির কাঁটা পাঁচের ঘরে গিয়ে পৌঁছোল। বাইরে ইম্পালা এসে দাঁড়াল, ড্রাইভার পরেশ এসে সেলাম জানাল। আমি ইম্পালায় চড়ে উডবার্ণ পার্কের দিকে যাত্রা করলাম।

মস্তবড় কম্পাউণ্ডওয়ালা সেই বাড়ীর দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। বাড়ী নয়, তাকে রাজপ্রাসাদ বলাই ভাল। ফটকের একদিকে পাথরের নেমপ্লেটে লেখা 'মায়াকুঞ্জ'! অপরদিকে আর একটি পাথরের গায়ে লেখা—মিঃ প্রবীর মজুমদার, এম-এ। দোতলা বাড়ী, দেখে মনে হয় অন্তত একশ' বছরের পুরোন কিন্তু এতটুকুও চিড় খায়নি কোথাও। সুন্দর সাজানো বাগানে দেশী ও বিলিতি ফুলের বাহার। বাড়ীর পেছন দিকে কয়েকটা আমগাছ কলাগাছের ভীড়, সামনের দিকে ইউক্যালিপ্টাস গাছগুলো আকাশ ছুঁতে চাইছে। এখানে ওখানে কয়েকটা বসবার বেদী। বাগানের মাঝখানে একটি কৃত্রিম ফোয়ারা—তার মাঝখানে ভেনাস ও কিউপিডের মর্মর-মূর্তি। একটা ঠাণ্ডা আভিজাত্য বাড়ীর চেহারায়, বাড়ীর চারপাশে। একটা প্রাণহীন নির্জনতা।

গেটে গুর্খা দারোয়ান ছিল, তার কোমরে খাপে-মোড়া ভোজালি। গাড়ী দেখেই সে টুল থেকে উঠে মিলিটারি ভঙ্গীতে সোজা হয়ে দাঁড়াল ও আমার দিকে তাকিয়ে সসম্ভ্রমে স্যালিউট করল।

গাড়ীবারান্দার তলায় গিয়ে গাড়ী দাঁড়াতেই ভেতর থেকে একট

ছাই রংয়ের বিশালকায় এ্যালসেশিয়ান কুকুর ছুটে এল, আমায় দেখেই গর্জাতে লাগল। আমি নামতে সাহস করলাম না। কুকুরটার গর্জনে আমার বুক কেঁপে উঠল।

ড্রাইভার পরেশ বলল, "আসুন সায়েব—"

আমি বললাম, "কুকুরটা যে—"

পরেশ বলল, "আমি তো আছি—ভয় নেই—ও সায়েবের পোষা কুকুর ছ'বছর আগে এই এতটুকু এনেছিলেন, এখন দেখুন বাঘ-মার্কা হয়ে উঠেছে—"

"সায়েব মানে?"

"আজ্ঞে শ্রীযুক্ত প্রবীর মজুমদার—বাইরে নাম লেখা দেখলেন না?"

"দেখেছি।"

"কই আসুন—এই মিকি—চুপ্ কর বলছি—"

কুকুরটার নাম মিকি—হয়ত 'মিকি মাউস' ছবি দেখেই মিঃ মজুমদার তাঁর কুকুরের নাম রেখেছিলেন। ভদ্রলোক রসিক বলে মনে হচ্ছে।

"মিঃ মজুমদার বাড়ীতে নেই?" আমি দরজা খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করলাম।

পরেশ আমার দিকে এক দুর্বোধ্য চাউনি মেলে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইল, তারপর বিনীত ভঙ্গীতে বলল, "মায়ের কাছেই জানতে পাবেন সায়েব। আসুন।"

নামলাম গাড়ী থেকে, মিকি নামক সেই ব্যাঘ্র-মেজাজী এ্যালসেশিয়ান কুকুরের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মেলে তাকালাম। বেগতিক দেখলেই একলাফে আবার গাড়ীতে ঢুকব। কিন্তু কুকুরটা হঠাৎ কেমন যেন সুর বদলে ফেলল, তার গর্জন গোঙানি হয়ে গেল। সে আমার দিকে এগিয়ে এল। পরেশ অবশ্য তার বকলস্ টেনে ধরল, আমিও গাড়ীর দিকে এক পা পেছিয়ে গেলাম। কিন্তু কুকুরটা ততক্ষণে

আবার কেঁউ কেঁউ করে কাতরোক্তির মত শব্দ করতে লাগল।

"কি ব্যাপার বলতো? কুকুরটা অমন করছে কেন? গাড়ীতে বসব নাকি?"

পরেশ মাথা ঝাঁকল, "আজ্ঞে ভয়ের কিছু নেই—আসলে আপনাকে চিনেও চিনতে পারছে না কিনা—তাই। হাজার হোক, দু' বছর বাদে তো, তাছাড়া জানোয়ার—"

কিসের দু'বছর? চিনেও চিনতে পারছে না মানে? আরে, চিনবে কি করে? আমি এই অ্যালসেশিয়ান-পুঙ্গবকে তো জীবনে এই প্রথম দেখলাম? পরেশ নামের ওই ড্রাইভারটা—

"ওঃ, তুমি এসেছ বাবা!" ঠিক সেই সময়েই মিসেস মজুমদারের গলা শুনতে পেলাম।

ঘুরে তাকালাম। মিসেস মজুমদার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর পরনে শুভ্র থান, তাঁর চোখে আনন্দ ও উত্তেজনার আভাস।

তিনি ডাক দিলেন, "এসো বাবা—এসো।"

পরেশ কুকুরটাকে টেনে ধরে রইল, আমি মিসেস মজুমদারের পেছনে পেছনে ড্রয়িংরুমে গিয়ে ঢুকলাম।

সুসজ্জিত কামরা। প্রাচীন দেশী আভিজাত্য ও বিলিতি আধুনিকতার সংমিশ্রণ। কামরার দেয়ালে কয়েকটি বিদেশী শিল্পীর আঁকা নৈসর্গিক চিত্রাবলী।

"বোস বাবা—আমি এক মিনিটে আসছি।"

মিসেস মজুমদার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি একা বসে বসে কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম। কেমন যেন ঠাণ্ডা একটা ভাব ঘরের মধ্যে। হঠাৎ মনে হল কেউ যেন আমায় আড়াল থেকে দেখছে। ঘুরে জানালার দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে জানালার ধারে একটি লোক ও একটি মাঝবয়সী স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে আমায় নিরীক্ষণ করছে। মনে হল বাড়ীর কোনও ঝি ও চাকর। আমি তাকাতেই তারা দ্রুত সরে গেল জানালা থেকে। কী যন্ত্রণা! আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। ঘরের এক কোণের দিকে তাকাতে দেখলাম যে একটি ছোট্ট

টেবিলের ওপর একটি ফুলদানীর মধ্যে রজনীগন্ধার গুচ্ছ। তারি পাশে একটি ছোট্ট ফোটো। একটি যুবতী স্ত্রীলোকের। বয়স কুড়ি একুশ হবে। অপূর্ব সুন্দরী। একসারি সুবিন্যস্ত দাঁতের সারি তার হাসির ফলে ঝকঝক করছে। মাদকতা আছে কিন্তু তার সঙ্গে কেমন যেন একটু বিষণ্নতাও বেশ মিশে আছে সেই হাসিতে। সেই ছবির দিকে তাকিয়ে ভাবতে চেষ্টা করছি যে মহিলা কে, এমন সময় মনে হল আবার কেউ পেছন থেকে দেখছে আমায়। ঘুরে তাকালাম। দেখলাম বছর ষাটের একটি লোক দাঁড়িয়ে। পরনে খাকী প্যাণ্ট ও ময়লা একটি শার্ট। আমি তাকাতেই সে দু'হাত তুলে নমস্কার জানাল ঝুঁকে পড়ে। আমি প্রতিনমস্কার করলাম বাধ্য হয়ে। কে লোকটা? মনে হচ্ছে বাড়ীর চাকর-বাকরদেরই কেউ হবে।

"কেমন আছেন ছোটহুজুর?"

ছোটহুজুর কে? কার কথা বলছে লোকটা? আর লোকটা টেনে টেনে কথা বলছে কেন?

"আমায় বলছেন?" প্রশ্ন করলাম!

"আমায় 'আপনি' বলছেন কেন ছোটহুজুর?"

"ছোটহুজুর কে?"

"আজ্ঞে আপনি।" বলেই লোকটি আমার দিকে দু'পা এগিয়ে এল। লক্ষ্য করলাম যে সে ডান পাটা টেনে টেনে অতি কষ্টে এগোল।

আমি তার পায়ের দিকে লক্ষ্য করছি দেখে লোকটি বলল, "তিন বছর ধরে ডান অঙ্গোটা পড়ে গ্যাছে হুজুর—কিন্তু তবু মাঠান মাইনে দ্যান, নইলে কী দশাই যে হত। অনেক পাপ করেছি যে তাই এমন—"

"ওঃ—তা মাঠান কে?"

"মাঠান!" লোকটি আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল তারপরে গলা নামিয়ে বলল, "আমায় চিনতে পারছেন না ছোটহুজুর?"

কী যন্ত্রণা! লোকটা বলে কি?

"না তো—কে তুমি? তোমায় তো এর আগে কোনোদিন দেখিনি

আমি!”

“দেখেননি!” লোকটির গলায় যেন বেদনা ধ্বনিত হল, “আমি যে ঘনশ্যাম।”

“ওঃ—”

ঘনশ্যাম আর একধাপ গলা নামিয়ে বলল, “ছোটহুজুর আপনার কি মল্লিকা দিদিমনির কথা মনে নেই?”

“মল্লিকা—কে সে?” আমি ভুরু কুঁচকে বললাম।

সঙ্গে সঙ্গে জানালা দরজার পর্দা দুলিয়ে একটা দমকা হাওয়া ঢুকল ঘরের মধ্যে। কেমন যেন শিরশির করে উঠল আমার শরীর আর হাল্কা একটা গন্ধ পেলাম আমি। ফুলের গন্ধ। ঐ রজনীগন্ধার কি? কিন্তু না তো, তেমন গন্ধ তো নয়। তাহলে কি যুঁই, হাস্নুহেনা, গন্ধরাজ? না, তাও নয়, একটা নাম না জানা ফুলের মৃদু সুবাস যেন আমার চারদিকে কয়েক সেকেণ্ড ঘুরতে লাগল, তারপরেই দমকা হাওয়াটা মিলিয়ে গেল, গন্ধও আর পেলাম না।

“ঘনশ্যাম আবার বলল, “চিনতে পারছেন না ছোটহুজুর—মল্লিকা দিদিমনি—সেই যে—”

“ঘনশ্যাম!” পেছনে মিসেস মজুমদার এসে দাঁড়ালেন, তাঁরও পেছনে একটি যুবতী ও সুন্দরী নেপালী আয়ার হাতে ট্রেতে নানারকমের জলখাবার ও চা।

ঘনশ্যাম পা টানতে টানতে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মিসেস মজুদারের চোখে তিরস্কারের দীপ্তি দেখলাম মুহূর্তের জন্য। ঘনশ্যামের চোখে অপরাধের কুণ্ঠা। কিন্তু ব্যাপার কি? আর কতক্ষণে এই রহস্যের শেষ হবে? পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে এখানকার চাকরবাকর ড্রাইভারেরা আমায় আর কেউ ভাবছে। নেপালী আয়াটি পর্যন্ত মিসেস মজুমদারের আড়ালে আমার দিকে তাকিয়ে যে মুচকি হাসল তা আমি বেশ বুঝতে পারলাম।

আয়াটি আমার সামনে, একটি টিপয়ের ওপর ট্রে রাখল। নানারকমের মিষ্টি ও কেক, পায়েস ও ক্ষীর, ফজলীআম, কলা ও

আঙ্গুর। আমার চক্ষুস্থির এই সমারোহ দেখে।

"নাও বাবা—কিছু মুখে দাও।" মিসেস মজুমদার একটি সোফায় বসতে বসতে বললেন। লক্ষ্য করলাম যে তাঁর হাতে দুটি এ্যালবাম রয়েছে।

নেপালী আয়াটি আমার দিকে আর একবার তাকিয়ে আবার সেই মুচ্‌কী হাসি হেসে ঘর থেকে লঘুপায়ে বেরিয়ে গেল।

আমি বিব্রত ভঙ্গীতে বললাম, "আমি এত খেতে পারব না—"

মিসেস মজুমদার স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, "তুমি যা পারবে তাই খাবে।"

"কিন্তু—"

"কিন্তু কি বাবা?"

"ওই ঘনশ্যাম আমায় আর কেউ ভেবে ভুল করছে কেন?"

মিসেস মজুমদার একটু সোজা হয়ে বসলেন, "চা খাও বাবা—এক্ষুনি সব জানতে পারবে।"

আমি নিঃশব্দে একটা মিষ্টি খেলাম, একটুকরো আম খেলাম তারপর চা-টা এক চুমুকে শেষ করে তাকালাম মিসেস মজুমদারের দিকে। তিনি আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। যেমন তিনি ইস্পালায় বসে তাকিয়ে থাকতেন আমার দিকে।

"বলুন মিসেস মজুমদার—"হঠাৎ মরীয়া হয়ে বললাম।

"এই এ্যালবাম দুটো তুমি দেখ বাবা—"

"কিসের এ্যালবাম?"

"দেখই না—" বলে তিনি তাঁর হাতের এ্যালবাম দুটো আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

আমি একটা এ্যালবাম খুলেই চমকে উঠলাম। সাহেবী-পোশাক পরা একটি যুবকের ছবি। অবিকল আমার মত দেখতে। অবিকল। একই নাক, একই চোখ, একই ঠোঁটের গড়ন, একই রকমের ঢেউ-খেলানো চুল, একই রকম শরীরের গড়ন। আমি দ্রুত এ্যালবামের পাতা ওলটাতে লাগলাম। নানা বেশের ছবি। নানা জায়গার।

পিকনিকে, বাগানে, সমুদ্র-সৈকতে, পাহাড়ের ওপর, বন্দুক হাতে জঙ্গলে। প্রথমটি দেখে দ্বিতীয় এ্যালবামটি খুললাম। সেই একই ব্যাপার। একজনের নানা ছবি। অবিকল আমার মত দেখতে সেই যুবক। তার পরে দ্বিতীয় এ্যালবামও শেষ হল দেখা। আমি দুটি এ্যালবামই আমার পাশে রেখে দিয়ে মিসেস মজুমদারের দিকে তাকালাম। দেখলাম বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলাম না। ঘরের মধ্যে স্তব্ধতা পীড়াদায়ক হয়ে উঠল। আমি এবার খানিকটা যেন বুঝতে পারলাম।

মিসেস মজুমদার মৃদুকণ্ঠে বললেন, "কি ভাবছ বাবা?"

"আজ্ঞে ইনি কে?"

"আমার ছেলে—প্রবীর মজুমদার—"

"তিনি এখন কোথা "

"নিরুদ্দিষ্ট—"

"কবে থেকে?"

"দু'বছর ধরে—"

"কিছুই বলে যাননি?"

"নিরুদ্দেশ হবার আগে বোম্বে বেড়াতে গিয়েছিলেন?"

"একা—না সঙ্গে কেউ ছিলেন?"

"একা।"

সাধু হয়ে যাননি তো? এমন তো হয়—"

মিসেস মজুমদার বললেন, "না বাবা, তা হতে পারে না।"

আমি তবু বললাম, "কি ভেবে বলছেন এমন কথা—এমন কত ঘটনা আছে—"

মিসেস মজুমদার বিষণ্ণ হেসে বললেন, "কিন্তু আমার একমাত্র ছেলেকে যে আমি চিনি বাবা—ভোগ বিলাসের মধ্যে সে আশৈশব প্রতিপালিত—তাছাড়া—তাছাড়া—"

কি যেন বলতে গিয়েও আর বললেন না মিসেস মজুমদার, থেমে

গেলেন।

আর ঠিক এমনি সময়েই দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়াল একজন যুবতী স্ত্রীলোক। দেখেই চিনতে পারলাম। ঘরের কোণে, টেবিলের ওপর যার ছবি আমি খানিক আগেই দেখেছি। একই চেহারা, শুধু বিষণ্ণতার প্রলেপটা যেন আরো গাঢ় হয়েছে মুখের ওপর, আরো খানিকটা পাক ধরেছে তার উৎফুল্ল যৌবনে। পরনে হালকা নীল রংয়ের একটা শিল্কের শাড়ী, গায়ে আধুনিক রুচির গয়না, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। চেহারায় মাদকতা আছে, বেশীক্ষণ চেয়ে থাকলে নেশা ধরে যাবে।

মিসেস মজুমদারের নজর গেল সেদিকে, তিনি বললেন, "এসো মা—"

যুবতী ভেতরে এল, তার চোখ আমার ওপর নিবদ্ধ। তাতে কৌতূহল। সেই সঙ্গে একটা নির্বিকার সুদূর ভাব। দু' পা এগিয়ে এল যুবতীটি কিন্তু কোন কথা বলল না। আমি তার চাউনি দেখে একটু অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম। যদিও আমার সেই সময়কার বয়স সেই যুবতীর উপস্থিতিতে বিচিত্র একটা আবেগও অনুভব করছিল তবু মনে হ'ল যে সে ঠিক ঐ ভঙ্গীতে আমায় না দেখলেই পারত।

হঠাৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সেই যুবতী বলল, "চলি মা—" বলেই সে রাজহংসীর মত গতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি মিসেস মজুমদারের দিকে তাকালাম। তিনি মৃদুকণ্ঠে বললেন, "ও রমা—প্রবীরের বৌ বাবা—"

বুঝলাম। তাই এই রাজেন্দ্রাণী ভাব! এত বড় বাড়ীর একমাত্র ছেলের উপযুক্ত বৌ হিসেবে ঠিকই মানিয়েছে।

মিসেস মজুমদার বললেন, "মজুমদার বংশের নাম আছে প্রাচীন কলকাতার ইতিহাসে। সিপাহী বিদ্রোহের পর এই বাড়ী তৈরী করেছিলেন আমার স্বামীর প্রপিতামহ—প্রায় আশি বছরের পুরোন এই বাড়ী কিন্তু এখনো সময় তাকে অন্তত আরো পঞ্চাশ বছর গ্রাস

করতে পারবে না।"

আমি কিছু বলার জন্যই বললাম, "আজ্ঞে তাতো বটেই—"

মিসেস মজুমদার আমার কথা যেন শুনতে পেলেন না, তিনি একই ভাবে নীচু গলায় বলে চললেন, "মজুমদারদের স্টীল ফ্যাক্টরী আছে, জমিদারী আছে, এক্সপোর্টের ইম্‌পোর্টের ব্যবসা আছে, মা লক্ষ্মীর কৃপা এঁদের ওপর বংশানুক্রমে চলে আসছে। আমার স্বামীর প্রপিতামহ শশাঙ্কশেখর মজুমদার কৃতীপুরুষ ছিলেন, তাঁর ছেলে সূর্যশেখর তেমনি ছিলেন, আমার শ্বশুর চন্দ্রশেখর মজুমদার এবং আমার স্বামী এঁরা পূর্বপুরুষদের পরিশ্রমে গড়ে-ওঠা ব্যবসাকে অধ্যবসায়ের সঙ্গে রক্ষা করে এসেছেন এবং এঁদের সবারই একটি প্রবল গুণ ছিল—চরিত্র। কিন্তু আমার ছেলে প্রবীর সেই চরিত্র অর্জন করতে পারছিল না। আমার স্বামী তেমন মিশুক ছিলেন না। আত্মীয়-বন্ধু থেকে তিনি দূরে, একান্তে থাকতেই ভালবাসতেন, ব্যবসা আর বাড়ীতে বসে পড়াশোনা ছাড়া অন্য কিছুতেই তাঁর আসক্তি ছিল না। আমার সঙ্গে তা নিয়ে কত মনান্তর হয়েছে। আমি এত ঘরকুনো ভাব পছন্দ করি না বলে প্রবীরকে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে দিতাম। সে লেখাপড়ায় ভাল ছিল কিন্তু বড়লোকের আদুরে ছেলে হওয়ার দরুণ এবং যা চাইত তাই পাওয়া তার প্রায় জন্মগত অধিকার হয়ে গিয়েছিল বলে কলেজে উঠতে না উঠতেই কুসংসর্গে পড়ল। তাই আমি তার বিয়ে দিলাম—গরীবের ঘর থেকে অসামান্য এই রূপ খুঁজে নিয়ে এলাম। ইতিমধ্যে ওর বাবা মারা গেলেন। ও আরো ডানা মেলে উড়ল—তারপর একদিন—" বলতে বলতে থামলেন মিসেস মজুমদার, তাঁর থান ধুতির আঁচল দিয়ে দু'চোখ মুছলেন।

ঘরে আবার স্তব্ধতা নেমে এল।

আমার অস্বস্তি লাগতে লাগল। বাইরে হাওয়া বইছে। ইউক্যালিপ্টাস গাছগুলো যেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে, ঘরে ম্লান আলোতে বিষণ্ণতা। মিসেস মজুমদার কাঁদছেন।

আমি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালাম, বললাম, "মাফ করবেন, এখন আমায়

যেতেই হবে।”

“যাবে? আর একটু বসো না বাবা, রাতে খেয়ে যাও—”

মিসেস মজুমদারের চোখে সস্নেহ মিনতি।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, “আজ্ঞে না অন্যদিন হবে—আজ এখন টিউশানিতে যেতে হবে—”

“ক’টি টিউশান কর তুমি?”

আমি বললাম কোথায় কাকে কখন পড়াই। মিসেস মজুমদার শুনলেন, তারপর উঠে দাঁড়ালেন।

“কাল আবার গাড়ী পাঠিয়ে দেব বাবা!”

“কাল? আমি আসব অন্যদিন।”

“না বাবা, কালই আসতে হবে। কথা দাও। বুঝতে পারছ না বাবা, আমি যে তোমার মধ্যে আমার ছেলের চেহারাটুকুও অন্তত খুঁজে পেয়েছি—”

মহিলার কথায় বুকটা কেমন যেন করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গেই বললাম, “আচ্ছা বেশ, আসব। কিন্তু গাড়ী পাঠাবেন না।”

“কষ্ট হবে যে তোমার!”

“আজ্ঞে না—কষ্ট হলে ট্যাক্সি করে আসব।”

“যেমন তোমার ইচ্ছে বাবা কিন্তু আসতে ভুলো না যেন—”

“আজ্ঞে আসব।” বলে পা বাড়ালাম।

মিসেস মজুমদার বললেন, “এখন কোথায় যাবে বল, গাড়ী পৌঁছে দিক।”

বললাম, “ট্রাম লাইনে ছেড়ে এলেই হবে।”

মহিলা আমায় বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। আসবার সময় বাইরের বারান্দার ডানদিকে, যেদিক দিয়ে একটা সিঁড়ি দোতালায় উঠে গেছে সেইখানে আমি সেই নেপালী আয়াকে দাঁড়ানো দেখতে পেলাম। সে আমায় দেখেই মুচ্‌কী হেসে মুখ ফিরিয়ে নিল। পরেশ গাড়ী নিয়ে এল, মিকি নামের সেই এ্যালসেশিয়ান কুকুরটা দু’একবার মাঝারি রকমের ‘খবর্দার’ ডাক ছেড়েই ঝিমিয়ে পড়ল, আমি গাড়ীতে

বসলাম এবং মিসেস মজুমদারের 'আবার এসো' অনুরোধে ঘাড় নেড়ে ও তাঁর দু'চোখের নিঃশব্দ কান্নাকে বুঝতে পেরে বিচলিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। গাড়ী ছেড়ে দিল। বাগানের ভেতর দিয়ে যখন গাড়ী এগোচ্ছে তখন একবার কেন যে পেছন ফিরে তাকালাম। দেখলাম দোতালার ব্যালকনিতে প্রবীর মজুমদারের স্ত্রী রমা দাঁড়িয়ে আছে, গাড়ীর দিকে অলসভাবে তাকিয়ে দেখছে। আসন্ন সন্ধ্যার বিবর্ণ, রহস্যময় আলোতে তার রূপ যেন আরো খুলেছে। বেচারী! আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

॥ দুই ॥

সেদিন রাতে আফিংখোর সুবোধ মুখার্জীর বাড়ীর নীচের তলাকার সেই বারো বাই পনেরো সাইজের কামরায় আমার ঘুম আসতে অনেক দেরি হয়েছিল। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, অল্প-শিক্ষিত, কলকাতার বিরাট জনসমুদ্রে নিতান্তই ব্যক্তিত্বহীন আমি হাবুডুবু খেতে খেতে কোনমতে বাঁচবার চেষ্টা করছিলাম। অন্য কোন চিন্তা ভাবনা আমার ছিল না, শুধুই লেখক হবার দুরাশা ছাড়া আর বাকী আশাই আমি জঞ্জাল বলে মনে করেছিলাম এমন সময়ে এ কী হল! এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা অবিকল আমারই ছাঁচে আর একজন মানুষ তৈরী করেই থামেননি, আমাকে সেই দ্বিতীয় মানুষটির জগতে নিয়ে কেন যে ফেললেন তাই সে রাতে ভাবতে শুরু করলাম। প্রবীর মজুমদার চরিত্রহীন ছিল সেকথা মিসেস মজুমদার বলার আগেই আমি অনুমান করতে পেরেছিলাম। অমন অপ্সরাবৎ সুন্দরী স্ত্রী থাকতেও যে সে অন্য নারীর সন্ধান করে বেড়াত তা ঘনশ্যামের কথায় এবং সেই যুবতী নেপালী আয়ার মুচকী হাসিই উদ্ঘাটন করে দিয়েছিল। কিন্তু এমন লোক নিরুদ্দিষ্ট হল কেন? মিসেস মজুমদারের কথাই ঠিক মনে হল—এহেন প্রবীর মজুমদার সংসারে বীতরাগ হয়ে রাতারাতি সন্ন্যাসী

হতে পারে না। তাহলে কি জন্য সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল? কেন? ব্যাপারটা খুবই রহস্যময় মনে হতে লাগল। ভাবলাম যে সেই রহস্যের সমাধান করব। আয়ার কাছ থেকে জানব কেন সে হাসে? জানব কে সেই মল্লিকা নামের মেয়ে। কিন্তু মনের ভেতরে আর একটি মন যেন অনবরত পাগলা ঘণ্টি বাজাতে লাগল—না, না, না, এসব থেকে দূরে থাকো, এ্যাডভেঞ্চারও এক ধরনের ঘোড়ারোগ, ও তোমার মত গরীবের পক্ষে ব্যয়সাধ্য বিলাসিতা হয়ে দাঁড়াবে—সাবধান। শেষ পর্যন্ত সে রাতে মনস্থির করলাম যে আমি আর এর মধ্যে থাকব না, আগামী কাল মজুমদারদের বাড়ী যাব না। মনস্থির করে তবে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোলাম।

পরদিন পুরোন দিনের মতই টিউশানি করে, টাইপিং স্কুলের চাকরি ও সন্ধ্যেবেলার মাস্টারি সেরে, বাড়ী ফিরে, যতীনের হাতের রান্না খেয়ে কাগজ কলম নিয়ে একটা এপিক উপন্যাস লিখবার তোড়জোড় শুরু করলাম। অনেক রাতে শুলাম।

এমনি দু'দিন কাটল।

তৃতীয় দিন ভোরে আবার চমকে উঠলাম। মিসেস মজুমদার পরেশকে নিয়ে হাজির হয়েছেন। পাছে আমার দেখা না পান সেই ভয়ে এত সকালে এসেছেন।

"আপনি!"

"তুমি কথা দিয়েও গেলে না যে বাবা?"

আমি বসতে বললাম, তারপর তাঁকে বোঝালাম যে আমার কাজের অসুবিধে হবে রোজ যেতে গেলে।

"পুত্রহারা এই মায়ের মুখ চেয়েও পারবে না বাবা—?" মিসেস মজুমদার আমার হাত ধরে বললেন, বলতে বলতে তাঁর চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

সেদিন যদি আমি শক্ত হতাম তাহলে হয়ত এ গল্প আমায় বলতে হত না। কিন্তু আমি তা পারলাম না এবং শেষ পর্যন্ত মিসেস

মজুমদারকে কথা দিলাম যে এখন থেকে সুযোগ পেলেই আমি যাব তাঁর বাড়ীতে। সারারাত ধরে যাওয়ার বিপক্ষে মনে মনে আমি যত যুক্তি গড়ে শান দিচ্ছিলাম তা সবই হঠাৎ ভোঁতা হয়ে গেল। মিসেস মজুমদার চলে যাবার পর আমি যাওয়ার স্বপক্ষেই এখন যুক্তি তৈরী করার চেষ্টা করতে লাগলাম। কি হবে গেলে ? এক বিচিত্র নাটকের সন্ধান পেয়েছি আমি, এক বিচিত্র গল্পের—দেখাই যাক্ না। জীবনকে এড়িয়ে কি কখনো কেউ সার্থক লেখক হতে পারে ? জীবনকে দেখার ব্যাপারে দুঃসাহসী না হলে কোনো লেখক কি স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে পারে ? সমুদ্রে ডুব না দিলে কি মুক্তো তোলা যায় ?

"দাদাবাবু—" যতীনের ডাকে চমক ভাঙ্গল। দেখলাম সে সসম্ভ্রমে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

"কি বলছ যতীন ?"

"উনি কে ? আপনার কাছে প্রায়ই—মানে আজকে কাঁদছিলেন—"

একটু ভেবে বললাম, "দূর সম্পর্কের মাসীমা—"

"কিন্তু সেদিন যে বললেন কেউ নন—" যতীন উকীলের চেয়ে কম নয়।

বললাম, "আগে জানতাম না—এখন জানতে পেরেছি কে।"

সুতরাং আবার উডবার্ণ পার্কের ওদিকে বিকেলবেলা গেলাম। আমায় দেখেই 'মায়া-কুঞ্জের' গুর্খা দারোয়ানের চোখের চাউনি বদলে গেল। যেন সে প্রধান সেনাপতিকে দেখল এমনি ভঙ্গীতে মিলিটারি কায়দায় স্যালুট করল। কম্পাউণ্ডে ঢুকতেই পরেশ ছুটে এল। একজন চাকর ছুটে ভেতরে গেল। মিকি সগর্জনে ল্যাজ নাড়ল। বসবার ঘরে যাবার আগেই অন্যান্য ঝি চাকর ও রাঁধুনী একের পর এক এসে দূর থেকে আমায় দেখে গেল। আমার বেশ মজা লাগতে লাগল। তারপরে মিসেস মজুমদার এলেন।

"এসেছ বাবা—বড় খুশী হলাম।" তিনি উদ্ভাসিত মুখে বললেন।

আমি ঘরের চারদিকে তাকিয়ে বললাম, "প্রবীরবাবুর ছবি ঘরে নেই কেন মিসেস মজুমদার ?"

মিসেস মজুমদারের মুখ ম্লান হয়ে গেল, তিনি বললেন, "ইচ্ছে করেই রাখি না বাবা। ছবি দেখলেই যে মনে পড়ে। যত মন্দই হোক, গর্ভে ধরেছি যে—"

কথা খুঁজে পেলাম না।

একটু থেমে তিনি বললেন, "তাছাড়া বৌমার মাথাটা কেমন যেন হয়ে গেছে, ছবি দেখলেই কেমন হয়ে যায়। তার স্বামী যে একনিষ্ঠ ছিল না তা সে-ও জানে কিন্তু তবু সে স্বামীকে ভালবেসেছিল। আজকাল ও বেশী কথা বলে না। আগে গানের চর্চা করত, আজকাল পিয়ানো কিংবা হারমোনিয়ম ছোঁয়ও না—"

মিসেস মজুমদারের কথা শুনতে শুনতে তাঁর পেছনকার জানালার দিকে নজর পড়ল। দেখলাম ঘনশ্যাম দাঁড়িয়ে আমায় দেখছে। আমার চোখ পড়তেই সে বাঁ হাত দিয়ে ডানহাত ধরে একটা নমস্কারের ভঙ্গী করেই সরে গেল। কী যন্ত্রণা, ঘনশ্যাম দেখছি ধরে নিয়েছে যে আমিই সেই।

এই সময়েই সেই নেপালী আয়া চা এবং জলখাবার নিয়ে এল। চোখোচোখি হতেই সেই সলজ্জ চোরা হাসি।

"কাঞ্চী—আজ সাহেব রাতেও খাবেন।" মিসেস মজুমদার বললেন।

"আচ্ছা।" বলে আর একবার আমার দিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কাঞ্চী যাবার জন্য পা বাড়াল।

আমি বললাম, "আজ্ঞে না—"

"কেন বাবা?"

"আমায় পড়াতে যেতে হবে।"

"আজকে না হয় না পড়ালে, একেবারে খেয়ে তারপরই বাড়ী যেও।"

রাজী হতেই হল অবশেষে। কাঞ্চী অদৃশ্য হল। আমি চা-পর্ব শেষ করলাম।

মিসেস মজুমদার বললেন, "তোমায় একটা কথা বলব বাবা—

একটা আবদার—"

"বলুন—" সপ্রশ্ন চোখ তুলে বললাম।

"আমায়—আমায় তুমি মা বলে ডেকো।"

তাকিয়ে রইলাম।

"বলবে না বাবা? ধর এ একটা খেলা—হ্যাঁ বাবা?"

মনটা নরম হয়ে গেল, বললাম, "আচ্ছা তাই বলব।"

"বল—"

বললাম, "একটা কথা বলব মা?"

"বল বাবা—বল—"

"এ বাড়ীর চাকরবাকরেরা সবাই কি মনে করছে যে আমিই আপনার হারানো ছেলে?"

"হয়ত। আমি তাদের এখনো কিছু বলিনি।"

"এটা কি ঠিক?" আমি তাঁর কথায় অবাক হলাম।

মিসেস মজুমদার বললেন, "এটা অনুচিত—আমি সে বিষয়ে অপরাধী বাবা—কিন্তু আমি যে—"

আমি বললাম, "আপনি থামলেন কেন মা?"

"তোমাকে বিশ্বাস করব বাবা?"

"আমাকে বিশ্বাস করতে না পারলে আপনার ডাকা উচিত নয়।"

"ঠিক বলেছ বাবা। বেশ, তোমাকে বিশ্বাস আজ পুরোপুরিই করলাম। তোমাকে এই দু'দিনেও যতটুকু বলেছি তাও আর কাউকে বলিনি। অনেক দিন ধরেই কারো সঙ্গে মিশি না আমরা, দু'বছর ধরে আরো মিশি না। তবু অনেকেই জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রবীরের বিষয়ে। বলি যে বিলেত গেছে, বলি যে ঝগড়া করে নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে। মিথ্যে কথা বলি, মিথ্যে বলে মজুমদার-বংশের মান বাঁচাই, ভুলেও বলি না যে বোম্বাইয়ের কাছাকাছি একটা হিল স্টেশনে কোনো নারী ঘটিত ব্যাপারে প্রবীর খুন হয়েছে—"

আমি চমকে উঠলাম, "খুন! সেকি!"

"হ্যাঁ বাবা।" আমি বোম্বাই পুলিশের চিঠি পেয়ে কাউকে

কিছু না বলে একা গিয়ে সব দেখে ও জেনে ফিরে এসে শুধু বৌমাকে বললাম সব কথা। তারপর তাকে নিয়ে বর্ধমানে গিয়ে শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া করলাম কিন্তু বৌমাকে আমি বিধবা সাজতে দিলাম না। সিঁথিঁতে সে সিঁদুর পরে না, শাঁখাও হাতে নেই, বাদ বাকী সব ব্যাপারে সে সধবা সেজেই আছে। এ পৃথিবীতে আমি ছাড়া ওর নিকট আত্মীয়ও আর কেউ নেই। সুতরাং ভাবনা নেই। ওই যুবতী মেয়েকে আমার মত বিধবা সাজাতে মন চাইল না আমার। ভবিষ্যতে যেদিন ও চাইবে হবে—যতদিন এই বেশভূষার সাধ থাকবে সাজগোজ করুক। কোলে যদি একটা বাচ্চা থাকত তাহলেও না হয় অন্যরকম ভাবতাম। ও তো আমার বৌমাই শুধু নয়, ওকে যে আজকাল আমি আমার মেয়ে বলেই মনে করি। এতে যদি কোন পাপ হয়ে থাকে সে পাপ আমার ওর নয়।”

মিসেস মজুমদার থামতেই প্রশ্ন করলাম, “কিন্তু এত বড় একটা খবর কি কাগজে বেরোয়নি ?”

“বেরিয়েছিল—কলকাতার পি. মজুমদার নামক একটি যুবকের মৃতদেহ জঙ্গলে পাওয়া গিয়েছে শুধু এইটুকুই খবর বেরিয়েছিল। তার বংশ পরিচয় যাতে না প্রকাশ পায় তার জন্যে আমায় প্রচুর টাকা খরচ কর্তে হয়েছে। তবে হ্যাঁ, আরো দু' একজন জানে একথা—সে জয়ন্ত বসু—প্রবীরের বন্ধু। কলকাতার পুলিশ তার সঙ্গে দেখা করেছিল তদন্ত-প্রসঙ্গে। আমাদের সলিসিটর মিঃ চৌধুরীও আমার কাছ থেকে জানতে পেরেছেন। তিনি না জানলে বিষয়-ব্যাপারে অসুবিধে হত এবং ছেলের অবর্তমানে মালিকানার জন্য আমায় কোর্টে দরখাস্ত করতে হয়েছিল সুতরাং জজ ও দু' একজন কর্মচারীও জানে একথা। আর কেউ নয়।”

“কে সেই স্ত্রীলোক যার জন্যে প্রবীরবাবু—”

মিসেস মজুমদার মাঝপথেই বললেন,“জানি না বাবা। শোনা যায়, স্থানীয় দু' তিনজনের সঙ্গে কাছাকাছি একটা জঙ্গলে শিকার করতে যায়। যাদের সঙ্গে গিয়েছিল তাদের থেকে সে নাকি বিচ্ছিন্ন হয়ে

পড়েছিল, তারপর তাকে মৃতাবস্থায় পাওয়া যায়, তার পিঠে একটি ছোরা বিঁধে ছিল। কে মেরেছে তা পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও এযাবৎ জানতে পারেনি।”

কিন্তু মিসেস মজুমদারের ভাবাবেগ আমায় পুরোপুরি জয় করতে পারল না। আমি বললাম, “যদ্দিন আমি আসিনি ততদিন না হয় চাকরবাকর বা সমাজের অনেকেই ভেবেছে যে প্রবীরবাবু উধাও হয়ে গেছেন। কিন্তু এখন কি করবেন? কি বলবেন?”

“বলব যে তুমি আর কেউ।”

“যদি বিশ্বাস না করে?”

“বিশ্বাস না করলেই বা—তোমার ভয়ের কি আছে? তুমি তো আসল প্রবীর নও বাবা। ভগবান তোমাকে পাইয়ে দিয়েছেন ছেলের কথা বেশী করে মনে পড়াতে চান বলে—তাঁর ইচ্ছেই পূর্ণ হোক।”

তাঁর কথার মধ্যে গভীর বিষাদের রেশ ছিল তাই আমার মুখে আর কোন কথা এল না। চুপ করেই রইলাম। তখন বেলা পড়ে এসেছে। ঘরের মধ্যে আলো ম্লান হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ মনে হল কেউ আমায় দেখছে। আমি মুখ তুলতেই দেখতে পেলাম যে মিসেস মজুমদারের পুত্রবধূ রমা জানালার ধারে এসে দাঁড়িয়ে আছে এবং আমাকে লক্ষ্য করছে। সেই আগেকার মতই সুদূর ও বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে, সেই একই মাদকতাময় যৌবনশ্রী নিয়ে। মাথার চুল আলুলায়িত, আজ এখনো খোঁপা বাঁধেনি সে। তাতে তার রূপ যেন আরো খুলেছে, কেমন যেন একটা বিশেষ ব্যক্তিত্ব অর্জন করেছে সে।

আমি তাকাতেও রমা সরল না, সেই একই ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। মনে মনে ভাবলাম যে মিসেস মজুমদারের কথাই সত্যি রমার মাথার ঠিক নেই। মনে মনে করুণা হল তার ওপর। আমি অন্যদিকে তাকালাম। আর ঠিক সেই সময়েই বাইরে মোটরের হর্ণ শোনা গেল।

জানালা থেকে রমা সরে গেল।

মিসেস মজুমদার চমকে উঠে বললেন, "কেউ এল বোধ হয়—তুমি আমার সঙ্গে এসো বাবা।" বলতে বলতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

আমি দাঁড়িয়ে বললাম, "কোথায়?"

"লাইব্রেরী ঘরে—যদি কেউ তোমায় দেখে তাহলে হয়ত এখন হৈচৈ শুরু করে দেবে।"

আমি তাঁকে অনুসরণ করে পাশের ঘরে গেলাম।

"এখানে বসে তুমি বই পড় বাবা—আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি আর যত তাড়াতাড়ি হয় আসছি—"

মিসেস মজুমদার চলে গেলেন। আমি বসলাম না, মস্ত বড় সেই লাইব্রেরী দেখে মোহিত হয়ে এক আলমারি থেকে আর এক আলমারি ছুঁয়ে বেড়াতে লাগলাম। ইতিহাস থেকে সাহিত্য, সাহিত্য থেকে দর্শন, দর্শন থেকে নাটক। মনে হল সেই শশাঙ্কশেখরের আমল থেকে প্রবীর মজুমদার পর্যন্ত চার পুরুষের সযত্ন সাধনাতেই এই লাইব্রেরী গড়ে উঠেছে।

আমি র‍্যাটিগানের একটি নাটক বের করে পড়তে বসে গেলাম। তখন সন্ধ্যে হতে আর দেরি নেই বলে আমি একটা বাতি জ্বালিয়ে নিলাম। কয়েক মিনিটেই নাটকের গতিবেগে যখন বেশ সঞ্চালিত হচ্ছি এমন সময় কাঞ্চী এক ট্রেতে চা আর বিস্কুট নিয়ে এল।

"চা এনেছি সাহেব—" কাঞ্চী ফিক্ করে হেসে বাংলাতে বলল। তার উচ্চারণ স্পষ্ট।

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, "রেখে যাও।"

"যাব?" কাঞ্চা রহস্যের সুরে বলল।

"হ্যাঁ!"

তবু গেল না কাঞ্চী, বরং দু'পা এগিয়েই এল আমার দিকে। আমি তাকালাম। কাঞ্চীর রূপ আছে, প্রবীর মজুমদার কেন একে আস্কারা দিয়েছিল তা বোঝা যাচ্ছে। কাঞ্চী সৌখীন মেয়েও বটে, তার বেশ-ভূষা দেখে আয়া বলে ভাবাই যায় না, তার গা থেকে একটা এসেন্সের [illegible] আসছে।

আমি বললাম, "দাঁড়িয়ে আছ যে?"

কাঞ্চী অভিমানের সুরে বলল, "আমায় চিনতেই পারছেন না যে—আমি আপনার গৌরী, হিমালয়ের মেয়ে গৌরী—মনে নেই আপনি বলতেন এসব কথা?"

আমি অনুমানে বুঝলাম, তবু বললাম, "না আমার মনে নেই—আসলে তুমি ভুল করছ—আমি তোমার সাহেব নই।"

"ইস্—"

"এবার দয়া করে এখান থেকে যাও।"

হঠাৎ যেন রাগ করে অভিমান করে কাঞ্চী ঘর থেকে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল। আমার বেশ মজা লাগতে লাগল। এক বিচিত্র নাটক চলছে আমার চারদিকে। বোধ হয় এসব ভগবানের ইচ্ছে, আমায় এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে তিনি উত্তীর্ণ করিয়ে সার্থকতায় নিয়ে যাবেন। জানতে হবে। এই কাঞ্চীর সঙ্গে কতখানি ঘনিষ্ঠ হয়েছিল প্রবীর মজুমদার। কি বিচিত্র ছিল ভদ্রলোকের লালসা! এই বাড়ীতে, একই ছাদের তলায় রমার মত সুন্দরী স্ত্রী থাকতে? কি সে কাঞ্চীর জন্য মজেছিল? গৌরী! হ্যাঁ, কাঞ্চীকে সেই নাম অক্লেশে দেওয়া যায়। মনে মনে স্থির করলাম যে এই নাটক কতদূর গড়ায় তা দেখতে হবে।

নাটক পড়তে শুরু করলাম আবার। কতক্ষণ কেটে গেল জানি না, হয়ত আধ ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট হবে। র‍্যাটিগানের নাটক তখন জমে উঠেছে এমন সময়ে হঠাৎ মনে হল যে কামরায় কেউ এসেছে। কেউ যেন লঘুপায়ে হাঁটছে, আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি একটা অজানা ফুলের গন্ধ পেলাম। যেমন দু'দিন আগে পেয়েছিলাম। দরজা জানালার পর্দা দুলিয়ে ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে হাওয়া এল ঘরে। আমি তাকালাম। কেউ নেই কোথাও। তবু মনে হল কেউ যেন আমার অতি নিকটে এসে সকৌতুকে আমায় নিরীক্ষণ করছে। আমি নিজের মনে হাসলাম। আমার কল্পনা শক্তি বাড়ছে। আমি নিজেকে নিজে সম্বোধন করে বললাম, 'হে শান্তনু রায়, তুমি অচিরেই একজন মহৎ

লেখক বলে স্বীকৃতি পাবে।'

আবার কিছুক্ষণ কাটল। সেই গন্ধ মিলিয়ে গেল মনে হল। সেই হাওয়া পড়ে গেল। আমি পড়তে পড়তে হঠাৎ সামনের দিকে মুখ তুলে দেখলাম যে প্রবীর মজুমদারের স্ত্রী দূরে এসে দাঁড়িয়েছে, আমায় দেখছে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম।

"বসুন।" রমা বলল। তার গলার আওয়াজ যেন জলতরঙ্গের বাজনার মত মনে হল।

আমি বসলাম।

রমা বলল, "আপনি একা একা বসে আছেন?" বলে সে বোধ হয় হাসবার চেষ্টা করল।

আমি বললাম, "তাতে আমার কষ্ট হয় নি, আমি বই পড়ছিলাম।"

"ওঃ—"

তারপরে আর কথা নেই। নিঃশব্দতা। বাইরে মিকির গর্জন শোনা গেল।

"আশ্চর্য!" রমা উচ্চারণ করল।

আমি তাকালাম, "আজ্ঞে?"

রমা বলল, "কিছু না। আমি অনেক সময় নিজের মনে কথা বলি।" বলে সে এবার শব্দ করে হাসল। হাসিতে ছন্দ ছিল, সে হাসি আমার রক্তে একটা অজানা আবেগ সৃষ্টি করল। কিন্তু সে হাসি সংক্ষিপ্ত ছিল, হেসেই থেমে গেল রমা।

"যাই—আপনি পড়ুন।" বলেই হঠাৎ রমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মনে মনে বললাম, হায় প্রবীর মজুমদার, এ তুমি কি করেছ!

আরো মিনিট কুড়ি বাদে মিসেস মজুমদার ফিরে এলেন। তিনি আমায় একা ফেলে গেছেন বলে লজ্জা প্রকাশ করলেন।

আমি বললাম, "আমার একা বেশ ভালই লাগছিল—আপনাদের লাইব্রেরীটি চমৎকার।"

মিসেস মজুমদার সখেদে বললেন, "এখন তো শুধু ধুলোই জমেছে।

তোমার যখন ইচ্ছে এসে বই পড়না তুমি—মনে কর এটা তোমারই লাইব্রেরী—হ্যাঁ বাবা ?"

আমার কথাটা খুব ভালো লাগল। কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথ আর নিবারণ দাশের ওল্ড বুক শপে আর আমার যাবার দরকার নেই মনে হল। যদিও ক'দিন আর আমার নেশাটা চালু নেই বলে মনে একটু দুঃখ হল তবু বললাম, "বেশ মা, আমি এই লাইব্রেরী আমার কাজে লাগাব।"

তারপর মিসেস মজুমদার নানা প্রশ্ন করে আমার জীবনের নানা কথা জানলেন। আমিও জানলাম যে মজুমদার বংশের ভবিষ্যৎ ভেবে তিনি কত চিন্তিত। প্রবীর মজুমদার অকালে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে এ পৃথিবী থেকে সরে গেছে, তার স্ত্রীকে বংশরক্ষার জন্য একটি সন্তানও উপহার দিয়ে যায়নি। একদিন মিসেস মজুমদার মারা যাবেন, তারপর রমাও যাবে নিশ্চয়। তারপর ? অন্ধকার। জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যে অনেকেই মনে মনে হিসেব কষছে আর প্রার্থনা করছে তাঁদের অপমৃত্যুর জন্য। ব্যাঙ্কে ও কোম্পানীর কাগজ মিলিয়ে প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা আছে জমে। ফ্যাক্টরী ছোট হলেও তার থেকে প্রায় বার্ষিক দু' লক্ষ টাকা আয় হয় তাছাড়া এক্সপোর্ট ইমপোর্টেও লক্ষাধিক। স্ত্রীলোক হয়ে তিনি আর স্টীল ফ্যাক্টরী চালাতে পারছেন না তাই শিগ্‌গীর তিনি সেটা একটি মাড়োয়ারীর কাছে বিক্রি করে দেবেন। আমি এই লক্ষ লক্ষ টাকার কথা শুনতে শুনতে কেমন যেন বোকা হয়ে গেলাম। এত অবলীলাক্রমে যে লক্ষ লক্ষ টাকার কথা মানুষে উচ্চারণ করতে পারে তা এই প্রথম দেখলাম। রাত ন'টায় ডিনার খেলাম আমি। মায়ের কথা আমার মনে নেই কিন্তু সেই রাতে হঠাৎ মনে হল যে মিসেস মজুমদারের মধ্যে আমি মায়ের স্বাদ যেন ফিরে পেলাম। রাঁধুনী এসে খাবার দিল। তাছাড়াও কাঞ্চী সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। মিসেস মজুমদার নিজে হাতে করে এটা ওটা আমার পাতে তুলে দিচ্ছিলেন। শেষের দিকে রমা এসে বসল একটা চেয়ারে। বসে বসে আমার খাওয়া দেখে যেমন নিঃশব্দে

এসেছিল তেমনি নিঃশব্দেই সে চলে গেল। গেল কিন্তু বিচিত্র একটা মাদকতাময় ব্যক্তিত্বের ছাপ রেখে গেল আমার মনে।

হাত ধুয়ে, পান খেয়ে যখন বাসায় ফেরার কথা বললাম তখন মিসেস মজুমদার আমার দিকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি মেলে বললেন, "আজ আর এই রাতে কোথায় যাবে বাবা—সকালেই যেয়ো।"

আমার চমক ভাঙ্গল, "না না, তা হয় না মা—যতীন ভাববে।"

"একটা কথা বলি বাবা ?"

"আজ্ঞে ?"

"তুমি তোমার জিনিসপত্তর নিয়ে এখানেই চলে এসো না—এত ড়ব বাড়ীটা খাঁ খাঁ করছে—"

হঠাৎ সব ব্যাপারটাকে অতি-নাটকীয় মনে হল। মনে হল সব বেজায় বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

মাথা নেড়ে বললাম, "তা হয় না মা—ওকথা আর বলবেন না। এবার আমি যাই।"

"কেন তা হয় না বাবা ?" মিসেস মজুমদার যেন জিদ ধরলেন।

আমি বললাম, "ওতে আমার কষ্ট হবে।" বলেই আমি পা বাড়ালাম।

মিসেস মজুমদার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "চল তোমায় এগিয়ে দিই। আজ রাত হয়েছে, গাড়ীতেই যাও।"

আমি আপত্তি করলাম না।

গাড়ী নিয়ে এল পরেশ। সেদিনও চাকরবাকরেরা উঁকি মেরে দেখল যে আমি যাচ্ছি। কাঞ্চী দেখল, রমা দেখল। মিসেস মজুমদার এবং রমা ছাড়া সবাই ভাবল প্রবীর মজুমদারই যাচ্ছে। তারা তাদের ছোটসাহেবের মাথা খারাপ হয়েছে ভাবল, ভাবল যে সাহেবের মা একটু একটু করে খেলিয়ে খেলিয়ে সাহেবকে বাড়ীতে এনে ফেলবেন। সারা রাস্তায় পরেশ কোনো কথা বলল না বটে কিন্তু সে যেমন সশ্রদ্ধ ভঙ্গীতে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে গেল তাতে আর বুঝতে বাকী রইল না যে সে আমাকে আসলে কী ভাবছে এবং কোন্ চোখে দেখছে।

সেদিন রাতে বাসায় ফিরতেই যতান ভুরু কুঁচকে তাকাল আমার দিকে, বলল, "এত রাত হল যে বাবু?"

"কোথায় রাত হল? দশটা বুঝি খুব রাত?"

"তা ঠিক—তাহলে খেতে বসুন।"

"আমি খেয়ে এসেছি, তুমি সেরে নাও।"

"কোথায় খেলেন, সেই মাসীমার বাড়ীতে নাকি?"

"অত খবরে তোমার দরকার কি?"

"আজ্ঞে কিছু না।" যতীন দ্রুত সরে গেল আমার কাছ থেকে।

ভাই ভরত, তখনো সময় ছিল হয়ত। তখনো একটু শক্ত হলে হয়ত জীবনে একটি অবিশ্বাস্য অধ্যায় যুক্ত হতো না। কিন্তু তাই বা বলি কি করে! ভাগ্যের চক্রান্ত তো ছিলই, নইলে আমার সঙ্গে প্রবীর মজুমদারের সাদৃশ্য হবার কোনও কারণ ছিল না, সাদৃশ্য থাকলেও মিসেস মজুমদারের দৃষ্টিপথে পড়ারও কোন হেতু ছিল না। তাছাড়াও আর একটা কারণ ছিল বইকি। সে আমার মন। ধীরে ধীরে তা যে মজুমদার পরিবারের দিকে ঝুঁকছিল ত আমার অজ্ঞাত থাকলেও সত্য বইকি।

এরপর আমি চার পাঁচদিন আধঘণ্টা একঘণ্টা করে যেতে শুরু করলাম 'মায়াকুঞ্জে'। সেই একই দৃশ্যের পুনরাভিনয় চলতে থাকল সেই ক'দিন। তারপর এক কাণ্ড ঘটল। ভাল কথা, এর মধ্যে একদিন দু'নম্বর বাসে একটি মেয়েকে লক্ষ্য করলাম। আগে সেই কথা বলে নিই।

আমি কলেজ স্ট্রীট থেকে উঠলাম বাসে। তখন রাত ন'টা বেজে গেছে। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। এই কলকাতার ব্যাপার তো জানিসই, বিকেল থেকে কয়লার ধোঁয়ায় চারদিকে একটা হাল্‌কা মসলিনের মত পরদা পড়ে যায়। তার ওপর রাত, তার ওপর আবার একটানা ঝিরঝির বৃষ্টি। এমনি আবহাওয়াতেই বাসে চড়লাম। ওয়েলিংটনের মোড়ে এসে বৃষ্টির বেগ বাড়ল আর ঠিক সেই সময় ব্যাগ হাতে একটি যুবতী মেয়ে ছুটে এসে বাসে উঠল এবং

উঠতেই আমার ওপর তার প্রথম চোখ পড়ল। সেই সময় হাওয়ার ধাক্কায় একছাট বৃষ্টির জল এসে আমার মুখে পড়ল আর একটা গন্ধ পেলাম। নামহীন একটা ফুলের সুবাস। ভাবলাম ভালো বিলিতী এসেন্স, হয়ত কোনো মেয়ের গা থেকে আসছে কিংবা ওই নবাগতার দেহনিঃসৃত।

মেয়েটির দিক থেকে আমি নজর ফেরাতে পারলাম না। বয়সের দোষ নয় কারণ আমি যে এমন অভদ্র কোনোকালেই নই তা তো আর তোকে বলতে হবে না ভরত। আসলে মেয়েটির চেহারার মধ্যে একটা আশ্চর্য ও চোখে পড়ার মত কিছু ছিল : ভাবতে লাগলাম কী তা। দেখলাম মেয়েটি নাতিদীর্ঘা, গৌরাঙ্গী, তন্বী ও ক্ষীণকটি? স্থির বিদ্যুৎ বলতে পারিস কাব্যের ভাষায়। মাথার চুল কোঁকড়ানো, খোঁপাটা মস্ত বড়, মনে হল এলোচুলের রাশি তার কোমরের নীচে সগর্বে নামে। পরনে সাধারণ তাঁতের শাড়ী কিন্তু পরার ভঙ্গীতে তা বিশিষ্ট ও মূল্যবান মনে হচ্ছে। মুখ একটু গোলমত, নাকটা যে খুব টিকোলো তা বলা যায় না, অনেকটা সেই নাক যা ভোঁতাও নয় কিংবা চোখাও নয় কিন্তু আবেগপ্রধান চরিত্রের পরিচায়ক। কানে দুটো মুক্তো (হয়তো 'কালচার্ড' মুক্তো), গলায় মটরদানা হার, হাতে ক'গাছা করে চুড়ি। মেয়েটির চেহারায় এমন একটা কিছু ছিল যাতে মনে হল যে সে এই সারা বাসে নিতান্তই খাপছাড়া, একান্তভাবেই বিশিষ্টা। আর তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য মনে হল তার দু'চোখে। চোখ দুটো যে ডাগর ডাগর তা বলব না তবে তা জ্বলজ্বল করছিল। যেন দুটি কৃষ্ণপক্ষ আকাশের তারা। কী স্বচ্ছ অথচ কী তীক্ষ্ণ!

মেয়েটির নজর আমার ওপরেই নিবদ্ধ রইল। কয়েক সেকেণ্ড বাদে আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। কে কি ভাববে কে জানে। কিন্তু আবার মনে হতে লাগল যে সে আমার দিকে ঠায় তাকিয়ে আছে। খানিক বাদে যেন আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার মাথাটা ডানদিকে ঘুরল। দেখলাম যে সত্যি সে তাকিয়ে আছে। ভাবলাম এ কী যন্ত্রণা! এই মেয়েটিও না বলে বসে, 'কি, চিনতে পারছেন না?' লক্ষ্য

করলাম যে মেয়েটির পাৎলা পাৎলা ঠোঁটের কোণে এবার একটু বাঁকা হাসির আভাস দেখা গেল। তাকে কেমন যেন নিষ্ঠুর মনে হল হঠাৎ। আমি আবার অন্যদিকে তাকালাম। তারপরে আর তাকাইনি, শুধু বৃষ্টি-ভেজা বাতাসের ঢেউয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে সেই অজানা ফুলের সুবাসটুকু ভেসে এসেছে। কি করে তা ভেসে আসছে ভেবে পেলাম না। বাস ছুটছে সামনের দিকে, হাওয়া আসছে সামনে থেকে এবং সামনের দিকে কোনো মহিলাই নেই। গন্ধটা যেন উজিয়ে আসছিল।

থিয়েটার রোডের কাছাকাছি এসে বাসটা থামল। কে যেন আমার কানের কাছে অস্ফুটে বলল, 'তাকাও'। আমি ফিরে তাকালাম। দেখলাম সেই মেয়েটি নেমে যাচ্ছে। নামবার আগে সে তাকাল, নেমেও সে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। চোখে সেই বিচিত্র চাহনি, ঠোঁটের কোণে সেই ক্রূর হাসির রেশ। কন্‌ডাক্‌টার ঘণ্টা বাজাল, বাস গোঁ গোঁ করে এগিয়ে গেল। সেই গন্ধ মিলিয়ে গেল। চলন্ত বাস থেকে শেষবার তাকিয়ে কিন্তু মেয়েটিকে আর দেখতে পেলাম না।

ঘটনাটা হঠাৎ মনে পড়ল বলে, বলে রাখলাম ভরত। এবার বলি কী কাণ্ড ঘটল কদিন পরে।

আমি সেদিন সকালে আফিংখোর সুবোধবাবুর দুরন্ত ছেলেকে নিয়ে যখন হিমশিম খাচ্ছি তখন হঠাৎ সুবোধবাবু কামরায় ঢুকে আমাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে বললেন যে তাঁর ছেলের জন্য আর মাস্টারের দরকার নেই এবং আমি যেন তিনদিনের মধ্যে তাঁর ঘরটি ছেড়ে দিই। তাঁর বিশেষ দরকার।

"বাঃ, আমি তাহলে যাব কোথায়?"

"তার জবাব দিতে আমি বাধ্য নই মাস্টারমশাই—"

ভাবলাম যে বোধহয় আফিংএর গুলিটা এখনো সুবোধবাবু গলাধঃকরণ করেননি, তাই প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে বললাম, "আপনি একটু দয়া করুন—"

সুবোধবাবু অত্যন্ত অভদ্র ভঙ্গীতে বললেন, "দয়া করতে আমি

পারব না শান্তনুবাবু—এতটুকুও নয়। জানেনই তো, আপনাকে আমি রসিদ দিই না—ব্যস্ এই শেষ কথা। তিনদিন বাদে, আসছে বুধবারে আমি ঘর খালি চাই। নমস্কার।”

মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। ঘর গেল, একটি টিউশন গেল। এবার? তখনো কি জানতাম যে কাণ্ডকারখানার সবে শুরু!

টাইপিং স্কুলের চাকরি করতে গেলাম যথাসময়ে। প্রোপ্রাইটর মিঃ পাল ডেকে একমাসের মাইনে বেশী দিয়ে বললেন যে তাঁর আর আমাকে কোনো দরকার নেই।

প্রায় আর্তনাদ করে বললাম, “মিঃ পাল, আমার কি কোনো দোষ হয়েছে, অপরাধ ঘটেছে?”

“না শান্তনুবাবু—আমার কোনো অভিযোগ নেই আপনার বিরুদ্ধে—আপনাকে আমি ফার্স্টক্লাশ ক্যারেক্টর সার্টিফিকেট দেব। আমি দুঃখিত যে আপনাকে বহাল রাখার ক্ষমতা আমার নেই। সেই সঙ্গে এই কথাও বলছি, এই চাকরি ছাড়লে আপনার ভালই হবে।”

মিঃ পালের কথার মধ্যে এমন একটা সমাপ্তির সুর ছিল যার পরে কোনো কথাই আর মুখে এল না।

কিন্তু আমার সেদিনকার দুর্ভাগ্যের ষোলকলা পূর্ণ হওয়ার কিছু বাকী ছিল। তাও সন্ধ্যার পর হল। রাতের টিউশনটিও গেল। সেখানেও একই কথা, আর মাস্টারের দরকার নেই।

টলতে টলতে রাস্তায় এলাম, সেই ভাবেই হাঁটতে লগলাম। বাসে চড়তে হবে সে খেয়াল হল বেশ কিছুক্ষণ পরে। খেয়াল হতেই বাসে চড়লাম কিন্তু কালীঘাটে পোঁছে খেয়াল হল যে ভবানীপুরে নামার ছিল। আবার ট্রামে চড়ে ফিরে এলাম। দু'দিন বাদে যে ঘর ছেড়ে দিতে হবে সেখানে মাথা নীচু করে ঢুকলাম। যতীন কামরায় ছিল, সে আমায় দেখে বিমর্ষভাবেই চুপ করে রইল। সে জানত যে আমার চাকরি গেছে।

আমি সে রাতে না খেতে পারলাম, না ঘুমোতে। খালি থেকে থেকে মনে পড়তে লাগল সারাদিনের ঘটনাবলী। মনে হল যেন;

হঠাৎ আমার ওপর শনির কোপদৃষ্টি পড়েছে। নইলে একদিনে সর্বস্বান্ত হই কি করে? এখন কি করি? কোথায় যাই? কোথায় গিয়ে উঠি? আবার কার কাছে গিয়ে টিউশনের খোঁজ নিই? এখন যা হাতে এসেছে আজ তাতে একমাস চলে যাবে বটে কিন্তু তারপর? তারপর?

॥ তিন ॥

পরের দিন সকালে উঠেই বেরিয়ে গেলাম। যত চেনা লোক ছিল, দূর ও নিকট যত আত্মীয় ছিল সবার সঙ্গে দেখা করলাম। কথায় কথায় জানতে চাইলাম যে মাসখানেকের জন্য থাকার জায়গা হবে কিনা কিংবা কোনো টিউশনের খোঁজ দিতে পারে কিনা। কেউ কোনো বিষয়ে সাহায্য করতে পারল না। আসলে ইচ্ছে করেই করল না। বিকেলে ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরব ভাবছি এমন সময়ে মাথায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। এই যে একসঙ্গে সব কাজ এবং বাসস্থান হারালাম এসবের পেছনে কি শুধুই গ্রহচক্রান্ত? মানুষের চক্রান্ত নেই? কিন্তু কে আমার পেছনে লাগবে? আমার সেই অদৃশ্য শত্রুর কোন্ স্বার্থ সিদ্ধ হবে এতে? মনে মনে এমনি প্রশ্ন করতে করতে যেন জবাব পেলাম—যেন কেউ মনের অন্তরাল থেকে ফিস্‌ফিস্ করে, বলল, 'মিসেস মজুমদার নয় তো?' চলতে চলতে থমকে দাঁড়ালাম।

সোজা 'মায়া কুঞ্জে' গিয়ে হাজির হলাম। গুর্খা দারোয়ানের দিকে নজর গেল না আমার, মিকির গর্জনের দিকে কান দিলাম না। সোজা গাড়ীবারান্দায় গিয়ে কলিংবেল টিপলাম।

"ছোটহুজুর—" ফিস্‌ফিস্ ডাক শুনলাম।

তাকিয়ে দেখি ঘনশ্যাম।

আমি রুক্ষকণ্ঠে বললাম, "চুপ কর—আমি তোমার ছোটহুজুর

নই—”

আমার গলার আওয়াজ পেয়ে কাঞ্চী প্রায় ছুটে এল বাইরে। বোধ হয় সে কাছাকাছি ছিল কোথাও।

“সাহেব!” সে মুগ্ধার মত উচ্চারণ করল।

আমি বললাম, “মিসেস মজুমদারকে ডাকো—”

কাঞ্চী মুহূর্তের জন্য যেন বিমূঢ় হয়ে রইল, তারপর দ্রুতকণ্ঠে বলল, “ডাকছি, এখুনি ডাকছি—আপনি বসুন।”

“না আমি বসব না, আগে ডাকো তাঁকে।”

“যাচ্ছি।” কাঞ্চী ছুটে ভেতরে গেল।

আমি ঘুরে ঘনশ্যামের দিকে তাকাতেই সে তার ডান পা টেনে টেনে আড়ালে চলে গেল।

মিকি আমার কাছে এসে আমার পা শুঁকল বারকয়েক। তারপর এককোণে সরে গিয়ে বসে পড়ল। আমি সেই উত্তেজনার মধ্যেও ভাবলাম যে এই কুকুরটা পর্যন্ত আমায় আলাদা কিছু ভাবছে। কিন্তু কেন? আমার গায়ের গন্ধও কি প্রবীর মজুমদারের সঙ্গে মেলে?

“এসো বাবা—এসো—” মিসেস মজুমদার হাসি মুখে বেরিয়ে এলেন। তাঁর পেছনে কাঞ্চী।

“আজ এত তাড়াতাড়ি তুমি আসবে তা আশা করিনি।” তিনি বললেন।

“আপনার সঙ্গে আমার কথা ছিল।” আমি গম্ভীর থেকেই বললাম।

“বাইরে দাঁড়িয়েই কি কথা বলতে হবে বাবা?” মিসেস মজুমদার মৃদু হেসে বললেন, “এসো ড্রয়িংরুমে বসি।”

আমি তাঁর পেছন পেছন ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসলাম। কাঞ্চী দরজা পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়াল।

মিসেস মজুমদার বললেন তার দিকে তাকিয়ে, “চা জলখাবার নিয়ে এসো—”

আমি বললাম, “ওসবের এখন দরকার নেই।”

মিসেস মজুমদার আমার দিকে তাকালেন না, শান্তকণ্ঠেই আবার পুনরুক্তি করলেন, "চা জলখাবার নিয়ে আয়—যা—"

কাঞ্চী চলে গেল। তার ছু'চোখে ভয়। আমার মেজাজ দেখে ভয় পেয়েছে।

মিসেস মজুমদার আমার দিকে তাকালেন, একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, "তোমায় আজ একটু উত্তেজিত মনে হচ্ছে!"

"তাই স্বাভাবিক।" আমি বললাম।

"কেন বাবা?"

"আমার চাকরি গেছে—"

"ওঃ—"

"আমার মাস্টারি গেছে—সব ক'টি—"

"তাইতো—তাহলে তো খুব অসুবিধেয় পড়লে বাবা—"

মিসেস মজুমদারের গলায় কোনো উদ্বেগ ধ্বনিত হল না কিন্তু!

আমি বললাম, "আপনি কি সত্যি দুঃখিত?"

"তার মানে? নিশ্চয়—বাঃ—"

"সত্যি করে বলুন।" আমি দৃঢ়কণ্ঠে বললাম।

তিনি তাকালেন আমার দিকে, বললেন, "না, আমি দুঃখিত নই বাবা। তুমি শিক্ষিত ছেলে, তোমার আরো ভালো কাজ করা উচিত, হওয়া উচিত, তোমার আরো—"

"থামুন—"

"কি হল বাবা?"

"কাজ জোগাড় করা কত কঠিন তা আপনি বুঝবেন না।"

"আমি বুঝি বাবা—আমি জানি আজকের পৃথিবীতে সুপারিশ ছাড়া ভালো কাজ জোগাড় হয় না। কিন্তু তুমি ভাবছ কেন, তোমার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।"

"কিন্তু আপনি নেবেন কেন? আপনি আমার কে?"

"আমি তোমার মা—"

"আপনি প্রবীর মজুমদারের মা—"

"আর তুমি যে আমার প্রবীরের মত দেখতে—তুমি যে আমায় মা বলে ডেকেছ—"

আমার রাগ যেন আরো বেড়ে গেল, আমি মিসেস মজুমদারের দিকে আঙ্গুল তুলে বললাম, "আমি বুঝতে পেরেছি—আপনি—"

মিসেস মজুমদার আমায় আর বলতে দিলেন না, গলার স্বর একধাপ ওপরে তুলে বললেন, "হ্যাঁ আমি—আমিই তোমার বেকার হওয়ার মূলে। তুমি ঠিকই ধরেছ—"

আমি উঠে দাঁড়ালাম।

"বোস বাবা—বোস—"

"না—আমি চললাম—"

"শান্তনু!" বলে মিসেস মজুমদার উঠে দাঁড়ালেন এবং পর-মুহূর্তেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

একজন বয়স্কা মহিলার এমন কান্না আমি ইতিপূর্বে আর কখনো দেখিনি। আমার অস্বস্তি হতে লাগল।

"শান্তনু—যেও না বাবা—আমি তোমার পায়ে পড়ছি বাবা—এই দুঃখিনী মায়ের বেদনা একবার বোঝবার চেষ্টা করো। অগাধ ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি সব থাকা সত্ত্বেও আমার কিছু নেই, আমি তোমার মুখ দেখে একটু শান্তি পেতে চাই ক'দিন বাবা। তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। আমি একটা মস্ত বড় মার্কেণ্টাইল ফার্মে তোমার জন্য চাকরি ঠিক করেছি—শুরুতে চারশো টাকা মাইনে—"

আমি বসলাম, মাথা নীচু করে বললাম, "কাঁদবেন না—কাঁদবেন না মা—"

মিসেস মজুমদার আমার দিকে তাকালেন, তারপর চোখ মুছতে মুছতেও কান্না থামাবার চেষ্টা করতে করতে বললেন, "রাগ করো না বাবা, যদি এতই দয়া করলে, ক্ষমা করলে, তাহলে আর একটা কাজ করো—"

"বলুন।"

"তুমি কালই তোমার জিনিসপত্র নিয়ে এখানে চলে এসো।"

"এখানে !"

"তাহলে বুঝব যে তোমার রাগ যায়নি। শান্তনু, তোমার কোনো কষ্ট হবে না—তোমার স্বাধীনতায় কেউ হাত দেবে না—তোমার যখন ইচ্ছে, যেদিন ইচ্ছে, তুমি চলে যেতে পারবে—"

ভাবছি কি জবাব দেব ঠিক সেই সময় জুতোর শব্দ পেলাম। কেউ আসছে। পেছন ফিরে তাকালাম। সাহেবী পোশাক-পরিহিত একজন লোক এসে দরজার সামনে এসেই আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

"প্রবীর !" সে বলে উঠল।

শব্দটাতে যেন ভয় ছিল। যেমন ভূত দেখলে মানুষ ভয় পায়। সেই ভয় লোকটির চোখের তারাতেও প্রকট হল।

মিসেস মজুমদার বললেন, "ও প্রবীরের মত দেখতে জয়ন্ত—প্রবীর না—"

তাহলে এই লোকটিই জয়ন্ত বসু। প্রবীরের বন্ধু।

"এঁর নাম শান্তনু রায়।' মিসেস মজুমদাব বললেন।

"ওঃ—নমস্কার—"

আমি হাত তুললাম প্রতি নমস্কার জানাবার জন্য। জয়ন্ত আমার কাছাকাছি এসে আমায় পর্যবেক্ষণ করতে করতে বলল, "খুব সিমিলারিটি আছে মাসীমা—স্ট্রেঞ্জ !"

আমিও জয়ন্ত বসুকে কাছে থেকে দেখলাম। বেশভূষায় পারিপাট্য আছে। বয়স ত্রিশ মত হবে, চেহারা সুশ্রীই বলা যায়। মাঝারি গড়নের, নাতিদীর্ঘ।

ছোট ছোট চোখ দুটোতে পিঙ্গল একটা ছায়া আছে বলে তার দৃষ্টিকে কেমন যেন কুটিল মনে হল। আর চোয়ালের গড়নে একটা শক্তির আভাস পেলাম। মনে হল জয়ন্ত বসু খুব জেদী লোক, যা চায় তা না পাওয়া পর্যন্ত থামে না।

"আপনি কোথায় থাকেন শান্তনুবাবু ?" জয়ন্ত প্রশ্ন করল।

"আগে পাটনায় থাকতাম—আপাতত দু'বছর ধরে কলকাতায়—"

"কলকাতায় ! অথচ একবারও দেখিনি !"

আমি বললাম, "কলকাতায় লক্ষ লক্ষ লোক থাকে।"

জয়ন্ত বসুর ভুরু কুঞ্চিত হল, সে বলল, "হ্যাঁ তা থাকে বটে—তা কিছু মনে করবেন না, কী করা হয় ?"

কি জানি কেন জয়ন্ত বসুর কথাবার্তা মোলায়েম এবং ভদ্র হওয়া সত্ত্বেও আমার লোকটির সান্নিধ্য ভালো লাগছিল না। আমি বললাম, "আপাতত বেকার—তবে হয়ত শিগ্গীরই একটা ভালো চাকরি পাব।"

"বটে ! বেশ—তা মাসীমার সঙ্গে কী করে আলাপ হল আপনার ?"

আমি একটা কড়া জবাব দিতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তার আগেই মিসেস মজুমদার বললেন, "তোমাকে অন্য সময়ে বলব বাবা—সে খুব মজার—"

কাঞ্চী চা নিয়ে ঢুকল। জয়ন্তকে দেখে তার মুখ চোখ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল।

মিসেস মজুমদার বললেন. "আরো কাপ আন্ কাঞ্চী—"

জয়ন্ত বলল, "না মাসীমা, আমি এখুনি চা খেয়ে আসছি—রমা দেবী কোথায় ?"

"ভেতরে আছে।"

"ওঃ—আচ্ছা আমি তাঁর সঙ্গে ত্নটো কথা বলে আসি।"

"আচ্ছা বাবা—"

জয়ন্ত বসু আমার ওপর একটা সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ভেতরের দিকে চলে গেল। কাঞ্চীও চায়ের ট্রে সামনে রেখে আমার দিকে একবার তাকিয়ে চলে গেল। আজ তার হাসবার সাহস হল না।

মিসেস মজুমদার কাপে চা ঢালতে ঢালতে বললেন, "এই প্রবীরের বন্ধু— ওদের প্রেস আছে, তাছাড়া শেয়ার মার্কেট।"

"তা চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে বটে যে বড়লোক।"

মিসেস মজুমদার তাকালেন আমার দিকে, একটা কাপ এগিয়ে

দিয়ে সুর বদলে বললেন, "তোমার জবাব কিন্তু পেলাম না বাবা—কাল সব জিনিসপত্র নিয়ে এখানে আসছ তো?"

মুহূর্তের জন্য ভাবলাম। মন্দ কি? একটা ভাল চাকরি পাব, এই বাড়ীতে না থাকলে তা বেহাত হয়ে যেতে পারে। বড়লোকদের মাথা তো, বিগড়োতে আর খুশী হতে খুব অল্প সময়ই লাগে। তাছাড়া দেখি না কতদূর গড়ায় এই পাগলদের সঙ্গে থাকতে গিয়ে। দেখি না কি গল্প দাঁড়ায়!

বললাম, "আসব মা।"

মিসেস মজুমদার বললেন, "বাঁচালে, তুমি আমায় বাঁচালে বাবা।"

অবশেষে পরদিন সকালে 'মায়া-কুঞ্জে' উঠে এলাম। যতীন টাইপিং স্কুলের অফিসে তার টিনের সুটকেস ও বিছানা নিয়ে চলে গেল। মজুমদার-বাড়ীর চাকরবাকরেরা সার বেঁধে আমার পদার্পণ দেখল। তাদের চোখে মুখে চাপা উত্তেজনা। কাঞ্চীর ঠোঁটের কোণে বারংবার হাসির জোয়ার এসে খেলা করতে লাগল। আর মিসেস মজুমদারের ব্যস্ততা দেখে মনে হল যেন কোনো রাজাগজার আবির্ভাব ঘটেছে অপ্রত্যাশিত ভাবে। যেন আমার আগমনে তাঁর ভাগ্যোদয় হচ্ছে। শুধু দেখতে পেলাম না প্রবীর মজুমদারের স্ত্রী রমাকে।

"কোন ঘরে থাকবে—তুমিই বল বাবা?" মিসেস মজুমদার প্রশ্ন করলেন।

"আমি কি করে বলব? আপনাদের বাড়ীর মানচিত্র তো আমার জানা নেই মা।"

"আচ্ছা এসো—লাইব্রেরী ঘরের পাশের ঘরটা তুমি দেখ পছন্দ হয় কিনা—"

আমি সাগ্রহে বললাম, "বাঃ, সেখানেই বেশ থাকব আমি—যখন দরকার ইচ্ছেমত বই পড়তে পারব।"

দেখলাম ঘরটা। লাইব্রেরী ঘর থেকে সে-ঘরে ঢুকতে হয়। সে-ঘর থেকে বাইরে যাবার আলাদা পথ আছে আবার অন্দরমহলের

বারান্দাতেও যাওয়া যায়। ঘরটা সুসজ্জিত। টেবিল চেয়ার, ডিভান, আলমারি ও পালঙ্ক সব রয়েছে। পূর্বদিকের জানালা দিয়ে আকাশের একফালি দেখা যায়। বেশ ঘরটি, শুধু কেমন যেন শব্দহীন, ঠাণ্ডা। তা ক্ষতি কি? দিব্যি নিরিবিলিতে লেখাপড়া করা যাবে।

"পছন্দ হচ্ছে বাবা?"

"চমৎকার—আমি এঘরেই থাকব।"

"বেশ, তাই থাক।"

সেই ঘরেই অধিষ্ঠিত হলাম।

সেইদিনই মিসেস মজুমদারের নির্দেশে ক্লাইভ স্ট্রীটের একটি মার্কেণ্টাইল ফার্মে গিয়ে মিঃ ড্রেক বলে একজন সাহেবের সঙ্গে দেখা করে সাড়ে তিনশো টাকা মাইনের একটি চাকরির কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেল। মিঃ ড্রেক প্রবীর মজুমদারের বাবাকে চিনতেন। কথা হল যে দিন সাতেক বাদে, মাসের প্রথম দিন থেকে কাজ শুরু করব।

সেদিন মনে কেমন যেন আনন্দ হল। ডালহৌসী থেকে সোজা কলেজ স্ট্রীটে গেলাম। পুরোন বই দেখতে দেখতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। হঠাৎ মেঘের ডাকে চমক ভাঙ্গল, শিগ্‌গীরই খুব জোর বৃষ্টি নামবে মনে হওয়ায় বাসের দিকে পা বাড়াব ভাবছি এমন সময় ফুলের গন্ধ ভেসে এল একটা দমকা হাওয়ার সঙ্গে। সেই অজানা ফুলের গন্ধ। আর মনে হল কে যেন ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'তাকাও—তাকাও আমার দিকে—'। কোনো নারীর কণ্ঠস্বর। আমি ডানদিকে তাকাতেই চমকে উঠলাম। সেই যে ক'দিন আগে বাসে দেখেছিলাম। সেই ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে থিয়েটার রোডের মোড় পর্যন্ত যে একই বাসে সেদিন চড়েছিল। সেই তন্বী, ক্ষীণকটি মেয়েটি যার দু'কানে দুটো মুক্তো, যার দুটি চোখে দুটি আকাশের তারা। সেদিনকার মত আজো সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আছে আমার থেকে মাত্র দু'হাত দূরে।

আমি তাকাতেই সে মৃদুকণ্ঠে বলল, "তাহলে এতদিনে বাড়ীতে ফিরেছ?" মেয়েটির গলায় যেন হাওয়ার দোলায় দোলায়িত ঝাউ-

গাছের দীর্ঘ নিশ্বাস। বেহাগের তানের মত মিষ্টি একটা স্বাদ।

আমি বিপদে পড়লাম। কি জবাব দেব? আমি তো চিনতে পারছি না!

অমন সুন্দরী মেয়ে অথচ তার গলাটা হঠাৎ যেন খুব কর্কশ হয়ে উঠল, "কী ব্যাপার, না-চেনার ভাণ করছ কেন?"

আমি আমতা আমতা করে বললাম, "আমার সঙ্গে ওভাবে কথা বলছেন কেন আপনি?"

"আচ্ছা। আবার আমাকে 'আপনি'ও বলছ! বেশ বেশ—"

আমি মরীয়া হয়ে বললাম, "কে আপনি?"

"কে আমি' একথা জিজ্ঞেস করতে লজ্জা হচ্ছে না? অবশ্য এই স্বাভাবিক—"

আমি দেখলাম যে পুরোন বইয়েব দোকানের একটি বিক্রেতা আমাদের কথাবার্তা শুনে রীতিমত উৎসুক হযে উঠেছে।

আমি বললাম, "আপনি এদিকে আসুন দয়া করে—" বলেই কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে একেবারে রাস্তায় নেমে দাঁড়ালাম।

মেয়েটি আমার কাছে এগিযে এল। মনে হল যেন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে এল। এমনি লঘু তার পদক্ষেপ, ছন্দোময় তাব গতি।

"কি বলছেন বলুন—"আমি বললাম।

মেয়েটি তাকাল! তাব দু'চোখ যেন জ্বলছে রাগে। সে বলল, "তবু চিনতে চাইছ না! এই দু'বছর ধরে আমি তোমায় কত খুঁজে বেড়াচ্ছি, কী জ্বালায় জ্বলছি সে কথা যে তুমি বুঝবে না তা জানি কিন্তু তাই বলে চিনতেও চাইবে না। ছিঃ—"

আমি বিপন্ন হয়ে বললাম, "আপনি হয়ত ভুল করছেন—আপনি আমায় নিশ্চয় অন্য কোন লোক ভাবছেন—"

মেয়েটি ব্যঙ্গের সুরে বলল, "বটে! তাহলে তুমি ভাণ করছ যে তুমি- প্রবীর মজুমদার নও! বেশ, আমি মাপ চাইছি। মহাশয়, আমাকে মার্জনা করবেন—আমার ভুল হয়েছে।" বলেই মেয়েটি দ্রুত, অথচ লঘু পদক্ষেপে এগিয়ে গেল।

কে মেয়েটি ? কি ওর নাম ?

মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে ভাবলাম কথাটা, তারপরেই সামনের দিকে পা বাড়ালাম মেয়েটিকে ডাকবার জন্য। কিন্তু দেখতে পেলাম না তাকে। বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গেলাম। এমন ভীড় ছিল না ফুটপাতে যে তাকে দেখা যাবে না তবু দেখতে পেলাম না মেয়েটিকে। চারদিকে তাকালাম, কোথাও নেই সে। রাস্তায় নয়, এ ফুটে নয়, ও ফুটে নয়—কি হল মেয়েটির !

হ্যারিসন রোড পার হয়ে কয়েক পা এগোতে না এগোতেই আমার ডানদিক দিয়ে একটা এস্‌প্ল্যানেডগামী ট্রাম ঢং ঢং করতে করতে হ্যারিসন রোড অতিক্রম করে এগিয়ে গেল। হঠাৎ নজরে পড়ল যে সেই ট্রামের ফার্স্ট ক্লাশের একটা সীটে সেই মেয়েটি বসে আছে। আমার সঙ্গে মুহূর্তের জন্য তার চোখোচোখি হল। সে মুখ ফিরিয়ে নিল। ভাবলাম ডাকি কিন্তু ট্রামটা এগিয়ে গেল। ভাবলাম আমিও ছুটি, পরের স্টপে ট্রামটা থামতেই উঠে বসব। কিন্তু ঠিক তখুনি ট্রাফিক পুলিশ হাত তুলল। হ্যারিসন রোড ধরে ট্রাম বাস ছুটতে আরম্ভ করল। আমি থামতে বাধ্য হলাম এবং লক্ষ্য করলাম যে এস্‌প্ল্যানেডের ট্রামটি ক্রমে দূরে হারিয়ে গেল। ঠিক তখুনি একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল কাছে। আমি ট্যাক্সিটাতে উঠে বসে সবেগে কলেজ স্ট্রীট ধরে চালাতে বললাম। পুলিশ হাত তুলতেই ট্যাক্সি ছুটল। কেমন যেন গোঁ চাপল মেয়েটিব পরিচয় জানবার জন্য।

"জোরে—একটু জোরে ড্রাইভার—"

ট্যাক্সি ছুটল। বৌবাজারের মোড় পার হয়ে সেই ট্রামটাকে ধরেও ফেলল। হ্যাঁ, সেই ট্রামই বটে। সেকেণ্ড ক্লাসের শেষদিকে একটা দাড়িওয়ালা বুড়ো বসে ছিল। সে আছে বসে। সেই ঘোমটাওয়ালা লাল-পাড় শাড়ীপরা বৌটিও আছে। কিন্তু ফার্স্ট ক্লাশের পাশাপাশি চলতে চলতে লক্ষ্য করলাম যে সেই মেয়েটি ট্রামে নেই হতাশ হলাম। মেয়েটি নেমে গেছে। কিন্তু এরি মধ্যে কোথায় নামল সে ? এতটুকু পথের জন্যই বা সে কেন ট্রামে চড়েছিল ?

ওয়েলিংটন স্কোয়ার এসে গিয়েছিল, ড্রাইভার প্রশ্ন করল, "কোথায় যাব এবার ?"

হঠাৎ ট্যাক্সি চড়ে অপব্যয় করবার সখ হল, জবাব দিলাম, "উডবার্ণ পার্ক—"

ঠিক তখুনি বৃষ্টি নামল। মুষলধারে।

'মায়া-কুঞ্জে' ফিরতেই মিসেস মজুমদার তিরস্কার করতে শুরু করলেন এত দেরি করে ফেরার জন্য। তিনি নাকি ভয়ানক ভাবনায় পড়েছিলেন।

আমি হেসে বললাম, "মায়েদের ভাবনার অন্ত আছে নাকি ?"

খানিক বাদেই খাবার ডাক পড়ল। জীবনে এই প্রথম টেবিল চেয়ারে খেতে বসলাম। আর সে কত রকমের খাবার! মিসেস মজুমদার এবং রমাও একই টেবিলে বসলেন। খেতে খেতে আমি লক্ষ্য করলাম যে পুরোন রাঁধুনি জগদীশ আমার দিকে সসম্ভ্রমে তাকিয়ে আছে। কাঞ্চী অদূরে দাঁড়িয়ে আমায় দেখছে। তার চোখে এক দুর্বোধ্য সংকেত যেন পড়তে পেলাম। আর লক্ষ্য করলাম রমাকে। খেতে খেতে সে কেমন যেন অন্যমনস্ক হযে পড়ছে আর আমার খাওয়া লক্ষ্য করছে। কেন ? আমার খাওয়ার ভঙ্গীও কি অবিকল প্রবীর মজুমদারের মত ?

খাওয়ার সময় মিসেস মজুমদার দু'একটা কথা বললেন আমার সঙ্গে কিন্তু রমা নির্বাক রইল। খাওয়ার পালা চুকে গেলে মিসেস মজুমদার আমার ঘর তদারক করে গেলেন। রাতের জন্য খাবার জল আছে কিনা, কোনো কিছুর দরকার হলে রামু নামক চাকরটিকে ডাকতে বললেন, তারপর সব বোঝানো হয়ে গেলে তিনি রাতের মত বিদায় নিলেন।

নতুন আবহাওয়ায় কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। বাইরে তখনো বৃষ্টি পড়ছে। দু'একটা ব্যাঙের ডাকও শুনতে পাচ্ছি। আশ্চর্য, সেই সুসজ্জিত কামরায় অতি আরামে বসে বই পড়তে পড়তে আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম। আমার কি জানি কেন মৃত্যুর কথা

মনে এল। মৃত্যু কি? মৃত্যুর পরে কী হয়? কোথায় যায় মানুষের প্রাণ? শাস্ত্রে কত কথা আছে এ বিষয়ে তা কি সব সত্যি?

রাত তখন এগারোটা সাড়ে এগারোটা হবে—হঠাৎ দরজায় মৃদু করাঘাত হল।

"কে?"

জবাব পেলাম না। পরিবর্তে আবার সেই করাঘাত।

দরজা খুললাম। দেখলাম কাঞ্চী দাঁড়িয়ে আছে।

"তুমি!"

"আস্তে সায়েব—রামু ওরা শুনতে পাবে।" বলেই সে ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

"কি চাও তুমি?" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"দেখতে এলাম আপনাকে। এই ঘরেই তো দেখা হত—"

হঠাৎ লেখকের কৌতূহল মাথায় চেপে বসল, চেয়ারে বসে প্রশ্ন করলাম, "বটে! —কেন দেখা হত?"

কাঞ্চী মুখে আঁচল চেপে হাসি থামাল, বলল, "যান্, আপনি কম দুষ্টু নন—এই ঘরেই তো এককালে—"

"কী এককালে—থামলে কেন?"

"যান—আমি বলতে পারব না।"

"হুঁ—প্রবীরবাবু বুঝি এখানেই শুতেন?"

কাঞ্চী আবার হাসি চাপল, "ইস্, তা বুঝি আপনার জানা নেই? এখানেই পড়াশোনা করতেন, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতেন আর মাঝে মাঝে মেমসায়েবের ওপর রাগের ভাণ করে যে এই ঘরেই শুতেন—"

"ভাণ? কেন?"

"তা নইলে কি আমি যেতে পারি আপনার ওপরের শোবার ঘরে?"

"বুঝেছি—এবার যাও।"

কাঞ্চীর মুখের চেহারা কালো হয়ে গেল, সে মৃদু গলায় বলল, "যাব? আমায় দেখে এতই ঘেন্না হচ্ছে আপানার?"

"বেশী কথা না বাড়িয়ে এবার যাও কাঞ্চী—তুমি ভুল করছ—আমি প্রবীর মজুমদার নই।"

কাঞ্চী বলল, "আপনি যে আমায় না চেনার ভাণ করছেন তা আমি জানি। হাজার হোক, আমি ঝি ছাড়া আর কিছু তো নই—"

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, "তুমি এখন না গেলে কিন্তু আমি মিসেস মজুমদারকে বলে দেব।"

কাঞ্চী আমার দিকে তাকিয়ে রইল, কথা বলল না। লক্ষ্য করলাম যে তার চোখ ছলছল করছে। মুহূর্তের জন্য শয়তানের ছায়া পড়ল আমার মনের ওপব। ভাবলাম আমি কি সুযোগ নেব? কাঞ্চী দেখতে সুন্দরী। আয়া বলে না জানলে আমি তাকে বডঘরের মেয়ে বলেও ভুল করতে পারতাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বিবেকেব কষাঘাতে আমি লজ্জিত হয়ে উঠলাম। ছিঃ, এসব কী ভাবছি আমি! আমি তো আজ পর্যন্ত এই ধরনের চিন্তা করিনি।

বললাম, "যাও কাঞ্চী, শুয়ে পড়গে।"

কাঞ্চী নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আমার একটু দুঃখ হল মনে। প্রবীর মজুমদার মেয়েটির সর্বনাশ করে গেছে। আশ্চর্য, দু'বছর আগে, আমারই মত দেখতে সেই প্রবীর মজুমদার এই ঘরে কাঞ্চীর সঙ্গে নিশ্চয়ই অন্য ব্যবহার করত। কী সাংঘাতিক চরিত্রহীন ছিল লোকটি!

হঠাৎ মল্লিকা নামের মেয়েটির কথা মনে পড়ল। কে মেয়েটি? কি রকম দেখতে ছিল সে? আজ সন্ধ্যেবেলায় কলেজ স্ট্রীটে যে মেয়েটি আমায় প্রবীর মজুমদার ভেবেছিল সে কে? সেই মল্লিকা নয় তো?

হঠাৎ একটু ভেবে আমি বাইরে বেরোলাম। বারান্দায় ঘনশ্যামকে শুয়ে থাকতে দেখেছিলাম একটু আগে। সেখানে গেলাম।

গাড়িবারান্দায় বাতি জ্বলছিল। ঘনশ্যাম একটা শতরঞ্জি বিছিয়ে শুয়ে ছিল।

আমি কাছে গিয়ে তাকে ডাকতেই সে চোখ মেলল।

"ছোটহুজুর!" সে অবাক হয়ে বলল।

"হ্যাঁ—একটা কথা জিজ্ঞেস করব তোমায়।"

"আজ্ঞে বলুন—" ঘনশ্যাম উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল।

বললাম, "না না, দাঁড়াতে হবে না তোমায়—বসেই বল। তুমি সেদিন মল্লিকার নাম করেছিলে না ?"

ঘনশ্যামের চোখে যেন আলো জ্বলে উঠল, সে ঘাড় নেড়ে বলল, "আজ্ঞে—"

"কেমন দেখতে সে ?"

"আজ্ঞে আপনার মনে নেই ?"

"তুমি বল না কেমন দেখতে ?"

"দেবীর মত সুন্দরী ছোটহুজুর, কী সুন্দর তাঁর চোখ দুটো! মাথার চুল কোঁকড়ানো, গোলমত মুখটা—"

"কোথায় থাকে সে তাতো জানোই—"

"আজ্ঞে জানি, একমাত্র আমিই জানি—আমিই তো গাড়ী ড্রাইভ করে নিয়ে যেতাম আপনাকে—"

"সে কি বৌবাজারের কোথাও থাকে ? কিংবা থিয়েটার রোড ?"

ঘনশ্যাম একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল, তারপর বলল, "আজ্ঞে ওর একটা জায়গাতেও নয়—মল্লিকা দিদিমনি থাকেন কসবার ওদিকে, একটা পুকুরের ধারে—"

"হুঁ—" বলে আমি ঘরে ফিরে যাবার জন্য পা বাড়ালাম।

"অনেকদিন দেখা হয়নি বুঝি ছোটহুজুর ?" ঘনশ্যাম নীচু গলায় প্রশ্ন করল।

"এ্যাঁ! না—আমি তাকে চিনি না ঘনশ্যাম। তুমি সেদিন নামটা বলেছিলে, তাই জিজ্ঞেস করলাম আজ কে সে।"

ঘনশ্যামের মুখে কিন্তু অবিশ্বাসের ভাবটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে সে আমায় সাময়িকভাবে অসুস্থ মনে করছে আমি আর কথা বাড়াবার সুযোগ দিলাম না তাকে, নিজের ঘরে ফিরে গেলাম।

তাহলে কি মল্লিকার সঙ্গেই দেখা হয়েছিল আজ আর সেই বর্ষণ-

মুখর রাতে? ঘনশ্যাম যা চেহারার বর্ণনা দিল তাতে তো তাই মনে হল। হঠাৎ মনে হল যে আরব্য-উপন্যাসের একটা গল্প আমাকে কেন্দ্র করেই তৈরি হচ্ছে। কিংবা আবু হোসেনের মতই আমি একজন। নেশা কিংবা ঘুমের ঘোরে হারুন-অল-রশীদের হারেমে এসে হাজির হয়েছি। সবাই আমায় প্রবীর মজুমদার মনে করছে। মল্লিকা। বোধহয় সেই সন্ধ্যেবেলায় দেখা মেয়েটিই মল্লিকা। নামটি মিষ্টি। ফুলের নাম। ফুলের মতই মিষ্টি দেখতে। কিন্তু সে-ও প্রবীর মজুমদারের খপ্পরে পড়েছিল? আচ্ছা, অধিকাংশ মেয়েরা চরিত্রহীনদের দিকে আকৃষ্ট হয় কেন? তারা নারী-চরিত্রের দুর্বলতার খোঁজখবর রাখে বলে? মল্লিকা মেয়েটিকে দেখে কিন্তু আরো কিছু মনে হয়েছিল —যেন সে অনন্যা। যেন সে চারপাশের মেয়েদের থেকে আলাদা। প্রবীর মজুমদার মল্লিকার রূপকে চিনতে ভুল করে নি। তার স্ত্রী রমার রূপ টানে পাতালের দিকে, মল্লিকার রূপ টানে মাটি ছেড়ে আর কোথাও নিয়ে যাবার জন্য। চরিত্রহীন প্রবীর মজুমদার কি এই পার্থক্য টের পেয়েছিল? কিন্তু আমি এত সব ভাবছি কেন? আমি লেখক হতে চাই বলে গল্প খুঁজছি—আমার এখন জানার পালা, ভাবনার পালা নয়। তাছাড়া মল্লিকার কথাই বা কেন ভাবছি? দূর, ঘুমোন যাক্—

আমি বাতি নিবিয়ে দিলাম। ঘর অন্ধকারে ভরে উঠল। বাইরে বৃষ্টি থেমেছে তখন। ব্যাঙেরা দল বেঁধে ডাকছে। দূরে কোথাও একটা কুকুর ডাকল। আরো দূরে কোথাও পেটাঘড়িতে রাত বারোটা বাজতে শুরু হল। আমি বিছানায় শুলাম আর সঙ্গে সঙ্গে জানালা দিয়ে হঠাৎ একঝলক হাওয়া এল, বাইরের ইউক্যালিপ্টাস গাছগুলো যেন সেই হাওয়ার দোলায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা গন্ধ পেলাম। সেই অজানা ফুলের গন্ধ। সেই গন্ধের মাদকতা যেন আমার দু'চোখে শিগগীরই ঘুমের প্রলেপ লাগিয়ে দিল। আমি ঘুমোলাম।

॥ চার ॥

আরো দু'দিন কাটল। প্রথমদিনের মতই। সেই একই রুটিন। একই গৎ। সকালে উঠে চা খাই, কাগজ পড়ি, লাইব্রেরীর বই ঘাঁটি। তারপর বেরোই, এলোমেলো ঘুরি, সন্ধ্যের আগে ফিরে আসি। আবার চা, জলযোগ; বই পড়া, রাতের খাওয়া এবং ঘুমোন। ঝি-চাকরদের সেই একই চাহনি—তাতে কৌতূহল, প্রবীর মজুমদার ভেবে সসম্ভ্রমে হুকুম তামিল করা। মিসেস মজুমদার উঠতে বসতে তদারক করেন, বসে বসে গল্প করেন আর তাকিয়ে তাকিয়ে তার মরা ছেলেকে আমার চেহারায় দেখতে পান। কাঞ্চী একটু গম্ভীর হয়ে থাকার চেষ্টা করছে দু'দিন ধরে, যদিও তার চোখেও তৃষ্ণা, আর অভিমান টলমল, ছলছল করে। আর রমা সেই একই ভঙ্গীতে দূর থেকে লক্ষ্য করে আমায়, মাঝে মাঝে শাশুড়ী থাকলে হঠাৎ কাছে এসে কয়েক মিনিট বসে আবার হঠাৎ উঠে চলে যায়। এই দু'দিন খাবার টেবিলে কিন্তু আমি তাকে দেখিনি। কেন জানি না।

এই দু'দিনে আমি মিকির সঙ্গে ভাব করে ফেললাম, বাগানের কোথায় কি দেশী বিলিতি ফুলের গাছ আছে সব জেনে নিলাম এবং বড়লোকের বাড়ীতে গরীব-ঘরের ছেলেদের যে অস্বস্তি হয় তা কমিয়ে আনলাম। আর ক'দিন বাদেই চাকরিতে যোগ দেব, তারপরে বাবাকে সুখবরটা দেব। এখনো আমি 'মায়া-কুঞ্জে' আসার কথা তাঁকে লিখিনি, হয়ত কিছু মনে করতে পারেন।

তিন দিনের দিন বিকেলবেলায় আমি প্রবাহমান গল্পস্রোতের নতুন একটি দিক সম্পর্কে অবহিত হলাম। সেদিন সারা দুপুর এত বৃষ্টি পড়ছিল যে আলস্যবশত আর বেরোইনি। বেলা তিনটের সময় বৃষ্টি যখন থামল তখন একটু দিবানিদ্রা সেরে উঠেছি। একটু আড়ামোড়া ভাঙতে না ভাঙতেই চা নিয়ে কাঞ্চী এসে হাজির হল।

"চা! এত তাড়াতাড়ি? কি করে জানলে যে ঘুম ভেঙেছে?"

কাঞ্চী হাসল, "মাঠাকৃরুনের হুকুম আছে যে মাঝে মাঝে উঁকি মেরে দেখে যেতে হবে—তাই ভাবলাম এখন হয়ত আপনার চায়ের

দরকার হবে—"

"বটে! থ্যাঙ্ক ইউ কাঞ্চনকুমারী—"

কাঞ্চীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "আপনি আমায় নতুন নাম দিলেন।"

"হ্যাঁ দিলাম—এবার যাও, গেট আউট কাঞ্চনকুমারী—"

বললাম লঘুভঙ্গীতে। কাঞ্চী গেল কিন্তু যাবার আগে আবার সেই পুরোন প্রগলভতার হাসি হাসল। অন্তরঙ্গতার হাসি। যৌন অন্তরঙ্গতার হাসি। সেই হাসি দেখেই অনুতাপ হল। কী যন্ত্রণা, অজ্ঞাতসারে আবার নিভন্ত আগুনে ফুঁ দিলাম!

চা খেয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। বৃষ্টিতে চার-দিককার সব ময়লা যেন ধুয়ে মুছে ফেলেছে। রোদ উঠেছে। আকাশ, বাতাস, বাড়ীঘর, গাছপালা সব কিছুর ওপরেই যেন নতুন রংয়ের প্রলেপ পড়েছে। হঠাৎ প্রবীর মজুমদারের সেই ঘরের মধ্যে যেন দম বন্ধ হয়ে এল। আমি চটিটা পায়ে গলিয়ে বাগানে বেরিয়ে গেলাম।

বারান্দায় ঘনশ্যাম বিড়ি টানছিল, আমায় দেখে উঠে বসল, বিড়িটা লুকিয়ে ফেলল।

"ছোটহুজুর—"

"কি খবর ঘনশ্যাম?"

"আজ্ঞে ভালই—"

আমি পা বাড়াতে গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম, বললাম, "তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে ঘনশ্যাম—আমার সঙ্গে বাগানে এসো—"

"আজ্ঞে—" ঘনশ্যাম হঠাৎ তৎপর হয়ে উঠল অতিমাত্রায়।

আমি বাগানের নিভৃততম অংশে গেলাম। সেখান থেকে বাড়ীর কিছুই দেখা যায় না, ফটকের দিকেরও নয়। বাগানের মাঝামাঝি, রাস্তার দিকে মুখ করলে ডানদিকটা। ঘনশ্যাম পেছু পেছু এল।

"ঘনশ্যাম—"

"আজ্ঞে?"

"প্রবীরবাবু কি মল্লিকাকে খুব ভালবেসেছিলেন?"

ঘনশ্যামের মুখে একটু সংকট দেখা দিল, সে একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আজ্ঞে—তা বেসেছিলেন। কেন ?"

"কি করে বুঝলে তুমি ?"

"আজ্ঞে আমায় যে আপনি যখন তখন নিয়ে যেতে বলতেন। দিদিমনির বাবা প্রথমে পছন্দ করতেন না আপনার যখন তখন যাওয়া—"

"কেন ? মানে তারপর কি পছন্দ করতেন ?"

"পরে তো তাই মনে হত—"

"এমন মতি পরিবর্তন হল কি করে ?"

"সে কথা তো আপনিই জানেন ছোটহুজুর।" ঘনশ্যাম একটু হাসবার চেষ্টা করল।

"কিন্তু এতে ভালবাসা প্রমাণ হয় কি করে ?"

"আজ্ঞে আপনি মল্লিকাকে নিয়ে গড়ের মাঠে, গঙ্গার ধারে, দক্ষিণেশ্বরে, বজবজে কত জায়গায় বেড়াতে যেতেন যে—"

"হুঁ।"

সব শুনতে বেশ মজা লাগছিল। অতীতের গর্ভ থেকে নানা কাহিনী উদ্ধার করা আর মাটির তলা থেকে প্রাচীন কোনো লুপ্ত রাজ-প্রাসাদকে পুনরুদ্ধার করাতে বোধ হয় একই ধরনের একটা উত্তেজনা আছে। ঘনশ্যামের মারফৎ অনেক কিছুই কি জানলাম না আমি !

"আচ্ছা তুমি যাও ঘনশ্যাম—"

ঘনশ্যাম চলে গেল। আমি একটা বেদীর ওপর বসে ভাবতে শুরু করলাম। তখনো গাছপালার পাতায়-জমা বৃষ্টির জল টুপ্ টাপ্ শব্দ করে পড়ছে আমার চারদিকে। আকাশে ধোঁয়ার মত কালো মেঘ উড়ে যাচ্ছে হাওয়ার ফুৎকারে।

হঠাৎ কেন জানি না আমার মৃত্যুর কথা মনে এল। মৃত্যু কি ' মৃত্যু কি নিঃশেষে শেষ হয়ে যাওয়া ? জীবন কি এই দেহযন্ত্রের স্পন্দনই শুধু ? ঘড়ি খারাপ হয়ে গেলে তো আবার ঠিক হয় তেমনি এই দেহযন্ত্রের অংশগুলো বদলে বদলে কি চিরকাল বাঁচা যায় না ?

কি সব ভাবছি আমি? আমার হাসি এল। এই মেঘমুক্ত প্রসন্ন রৌদ্রালোকে প্রজাপতিদের উড়তে দেখছি আমি, জীবনের জয়গান চারদিকে তবু কেন মৃত্যুর কথা ভাবছি?

হঠাৎ কার যেন গাড়ীর শব্দ পেলাম। সামনের হাস্নুহানার ঝোপ একটু সরিয়ে দেখলাম যে জয়ন্ত বসু একটা ফিয়াট গাড়ী চালিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ থেমে গেল আচম্‌কা ব্রেক কষে। তারপর কাকে দেখে দ্রুত গাড়ী থেকে নেমে সে আমার দিকে আসতে আসতে এক জায়গায় থেমে গেল। তাকে আর দেখতে পেলাম না, তবে তার গলার আওয়াজ শুনে মনে হল যে আমার প্রায় কাছাকাছি কোথাও সে দাঁড়াল।

"খুকু! তুমি এখানে কি করছ!"

রমার গলার আওয়াজ পেলাম, "ভেতরে হাঁপ ধরে গিয়েছিল তাই বাগানে এলাম একটু—"

সেকি! রমার পায়ের শব্দ তো একটুও কানে যায়নি! কখন এসেছে সে? আমার ও ঘনশ্যামের কথা সে শোনেনি তো?

জয়ন্তর গলার আওয়াজ পেলাম, "একটু ঘুমিয়েছিলে বুঝি?"

"হুঁ—"

"বেশ দেখাচ্ছে—"

"ওসব কথা থাক জয়ন্তবাবু—"

"কেন খুকু?"

রমার তাহলে একটা ডাকনাম আছে!

"আপনাকে কতদিন বলেছি না ও-নামে আমায় ডাকবেন না?"

"কিন্তু নামটা তোমারই তো?"

"তা হোক—"

"ডাকি তো আড়ালে তোমায়—তোমায় তো আজ থেকে চিনি না —মিসেস প্রবীর মজুমদার হবারও অনেক আগে থেকে আমাদের চেনাশোনা—তাতে লজ্জার বা ভয়ের কি আছে? তাছাড়া প্রবীর তো এখন নেই—সে মৃত।"

"আপনার সব কথাই ঠিক কিন্তু আপনার মুখে 'খুকু' ডাকটা শুনতে আমার ভাল লাগেনা।"

"কেন ভালো লাগে না? আমি যে সারাজীবন তোমায় ঐ নামে ডাকতে চাই খুকু—যে সিঁদুর-পরার খেলা তুমি মিসেস মজুমদারের উদ্ভট খেয়ালমত চালিয়ে যাচ্ছ সেই খেলাটাকে এবার সত্য করে তোলো—মিসেস বসু হিসেবে—"

"জয়ন্তবাবু—" রমার কণ্ঠস্বর যেন ভৎর্সনায় তীব্র হয়ে উঠল।

"কি হল?"

"কিছু না—এখানে কথা বলতে আমার ভাল লাগছে না এবং এসব কথাও নয়। গল্প করতে হলে চলুন ড্রয়িংরুমে যাই—"

"তাই চল, কিন্তু রাগ কোরো না রমা। তোমার রাগের জন্য তো আমি এখানে আসি না—"

"তাহলে কী জন্যে আসেন?"

"না বোঝার ভাণ করলে কিন্তু বিপদে পড়ব রমা—"

"কী জন্যে আসেন বলুন না—"

"ওয়েল—তোমার অনুরাগের প্রত্যাশায়—"

"ড্রয়িংরুমে চলুন।"

রমার গলায় কি ছিল শেষ কথায়? কাউকে ভালো না বাসলেও ভালবাসার কথা অনেক সময় ভালো লাগে—তেমনি একটা ভালো লাগার সুর কি ছিল রমার গলায়?

আমার চারদিকে গল্প জটিল এবং জমাট হয়ে উঠছে। এইমাত্র যে তথ্য পেলাম তাতে নানা প্রশ্ন মনে আসতে লাগল। জয়ন্ত বসু রমার প্রতি আসক্ত। মনে হচ্ছে রমার বিয়ের আগে থেকেই সে আসক্ত ছিল। মনে হচ্ছে রমা তাকে ভালোবাসে না—

"সাব্—"

হিন্দুস্তানী ছোকরা চাকর বলবীর এসে আমায় ডাক দিল। মিসেস মজুমদার আমার খোঁজ করছেন।

ওদিকে গিয়ে দেখলাম যে মিসেস মজুমদার ড্রয়িংরুমেই বসে

আছেন একরাশ খাবার এবং আর একপ্রস্থ চা নিয়ে। তিনি আমার বাগানে ঘুরে বেড়াবার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আমার কি ভালো লাগছে না? মন খারাপ? আমি জানালাম যে চিন্তার কোনো কারণ নেই। তিনি সস্নেহে আমায় খাওয়ালেন বসে বসে।

হঠাৎ তিনি বললেন, "তোমার খাওয়ার ভঙ্গীটি পর্যন্ত এক—"

"আজ্ঞে?" চমকে তাকালাম।

"অবিকল প্রবীরের মত—ঠিক অমনিভাবে বাঁ দিকে একটু মাথাটা কাৎ করে আব কোনদিকে মন দিয়ে খেত সে—যেমন তুমি—" বলতে বলতে তাঁর চোখে বুঝি একটু জল চিক্‌চিক্ করে উঠল।

মায়ের প্রাণের এ আর এক উদ্ঘাটন বটে। আমার অন্তর দুলে উঠল। সেই সঙ্গে আমি ভাবলাম যে আমায় অবিকল প্রবীর মজুমদারের মত তৈবী করে ভগবানের কোন্ স্বার্থ সিদ্ধ হবে? নাটক যেন ক্রমেই ইণ্টারেস্টিং হয়ে উঠছে মনে হল। আমার ইচ্ছে হল জয়ন্ত বসু কোন্ ঘরে বসেছে তা একবার জেনে নিই। রমা তো ড্রয়িংরুমের কথা বলছিল কিন্তু এখানে তারা বসল না কেন?

"বাইরে একটা গাড়ী দেখছি মা—?"

মিসেস মজুমদারের মুখে কেমন যেন একটা ছায়া ঘনাল, তিনি বললেন, "ও জয়ন্তর গাড়ী—"

"ভেতরে বসেছেন বুঝি?"

"হ্যাঁ—ওপরের বসবার ঘরে—বৌমার সঙ্গে গল্প করছে।"

"বেশ লোকটি—"

মিসেস মজুমদার আমার দিকে চকিতে তাকালেন, তারপর বললেন, "তোমার তো আর চারদিন বাদে জয়েনিং ডেট্ চাকরিতে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

বেশ বুঝতে পারলাম যে মিসেস মজুমদার জয়ন্ত বসুকে নিয়ে আলোচনা করতে রাজী নন, তিনি ইচ্ছে করেই কথার মোড় ফিরিয়ে দিলেন।

খানিক বাদে টেলিফোন বাজল হলঘরে। মিসেস মজুমদার উঠে

গেলেন।

পায়ের শব্দ পেলাম। মুখ তুলে দেখলাম যে দরজার গোড়ায় জয়ন্ত বসু দাঁড়িয়ে।

আমায় দেখেই দু' হাত তুলে নমস্কার জানাল সে।

"কি শান্তনুবাবু, কেমন আছেন ?"

"আজ্ঞে ভালই আছি—বসুন—" আমি উঠে দাঁড়ালাম।

লক্ষ্য করলাম যে জয়ন্ত বসুর মুখ বেশ উজ্জ্বল, হাসিখুশী ভাব।

"না মশাই, বসব না—প্রেসে একটা মস্তবড় অর্ডার এসেছে, একবার তদারক না করলেই নয়। তারপর, এখানেই আছেন ?"

আমি সবিনয়ে বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"থাকতে ভালই লাগছে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, মিসেস মজুমদার মায়ের মত আমাকে—"

"বুঝেছি বুঝেছি—তা তো করবেনই তিনি—আপনি যে অবিকল প্রবীরের মত দেখতে—দি ঘোস্ট্ অব প্রবীর—হাঃ হাঃ হাঃ।" নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল জয়ন্ত বসু।

আমি হাসব কিনা ভাবছি এমন সময়ে জয়ন্ত গলার সুর নামিয়ে পরিহাসতরল কণ্ঠে বলল, "আপনি দেখতে প্রবীরের মত, প্রবীর আমার বন্ধু ছিল, তাই বন্ধুভাবেই কথাটা বলি—কি বলেন ?"

"আজ্ঞে বলুন—"আমি বিনয়ের সঙ্গে একটু শ্লেষও বোধহয় মেশালাম।

"প্রবীরের মত দেখতে আপনি তা তো আর আপান ইচ্ছে করে হন নি—তাতে আপনার দোষ নেই কিন্তু সাবধান মশাই, প্রবীর মজুমদার হবার কিন্তু চেষ্টা করবেন না—"

"তার মানে ? আপনার কথা—"

"আমার কথা খুবই সরল ভাই, আপনি যাতে মনে রাখেন যে আপনি শ্রীশান্তনু রায় সেই কথাটাই অন্য ভঙ্গীতে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম।"

"কিন্তু কেন বলুন তো ?"

"তা তো বলতে পারব না ভাই শান্তনুবাবু—আপনি বুদ্ধিমান লোক—হয়ত পরে কোনো অর্থ খুঁজে পেতে পারেন। না পারলেও কোনো কিছু বলার নেই তবে ফলাফল জটিল হয়ে উঠতে পারে। জানেনই তো মশাই, আমরা অনবরত গ্রন্থিমোচনই করতে চাই—আচ্ছা নমস্কার শান্তনুবাবু—আজ আসি—" বলেই একেবারে সোজা গট্‌গট্ করে বেরিয়ে গেল জয়ন্ত বসু।

আমি বুঝতে পারলাম যে এ বাড়ীতে আমার দীর্ঘকাল থাকাটা জয়ন্ত বসুর ভালো লাগছে না এবং পরোক্ষে সে শাসিয়ে গেল যাতে আমি প্রবীর সেজে বেশী সুযোগ না নিই। 'দি ঘোস্ট্ অব প্রবীর'—প্রবীরের প্রেত আমি! আমার লোকটার বিরুদ্ধে একটা আক্রোশ মনের মধ্যে জমা হতে লাগল। বিশ্বাসঘাতক লোক—নইলে প্রবীর মজুমদারের বন্ধু হয়েও সে প্রবীরের বিধবার প্রতি আসক্ত হয় কি করে? আইনের দিক থেকে বৈধ অনেক কিছুই আছে কিন্তু নীতির দিক থেকে তার সব কিছুই কি সমর্থন পেতে পারে?

আমি উঠে দাঁড়ালাম। ঠিক সেই সময়েই মিসেস মজুমদার ফিরে এলেন।

"কোথাও যাচ্ছ নাকি বাবা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—ভাবছি একটু বেড়িয়ে আসি।"

"তাড়াতাড়ি এসো কিন্তু—গাড়ী নিয়ে যাও না হয়—"

"আজ্ঞে না—তার দরকার নেই।"

আমি বেরিয়ে গেলাম। এলোমেলো ঘুরলাম। পুরোন বইয়ের বাজারে যাবার কথা আর সেদিন মনে পড়ল না। আমি গেলাম বালীগঞ্জের দিকে। সন্ধ্যে হল। আবার আকাশে মেঘের পঙ্গপাল উড়ে এল, পশ্চিম দিগন্তে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। ভাবলাম কেন ঘুরছি এভাবে? দূর মজুমদার-বাড়ীতেই ফিরে যাই। আজ থেকে একটা উপন্যাসে হাত দেব।

উডবার্ণ পার্কের ওদিক দিয়ে যখন হেঁটে যাচ্ছি তখনো নামেনি। আমি বড় বড় পা ফেলে চলছি হঠাৎ ঠাণ্ডা হাওয়া এল

মনে হল কে যেন ডাকছে। কোনো শব্দ শুনতে পেলাম না কিন্তু তবু মনে হল কেউ ডাকছে, কেউ যেন পেছন ফিরে তাকাতে বলছে। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা ফুলের গন্ধ পেলাম। গন্ধটা চেনা। তাকালাম পেছন ফিরে। কোথাও কেউ তো নেই।

মুখ ফেরাতে যেতেই চমকে উঠলাম। রাস্তার বিপরীত দিকে, ডানপাশে সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে! আশ্চর্য, আমি এতই অন্যমনস্ক ছিলাম যে মেয়েটিকে দেখতেও পাইনি। সেই মেয়েটি, যাকে একদিন বাসে দেখেছিলাম, যে একদিন কলেজ স্ট্রীটে রাগারাগি করে চলে গেল।

দেখলাম মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার নজর পড়তেই সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলতে আরম্ভ করল।

মুহূর্তের মধ্যে মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল।

আমি ডাকলাম, "মল্লিকা—"

মেয়েটি ফিরে তাকাল না, শুধু চলার বেগ বাড়াল।

আমি মরীয়া হয়ে উঠলাম। আমায় জানতেই হবে যে এই মেয়েটি মল্লিকা কিনা। আমি দ্রুতপদে রাস্তা পার হয়ে তার অনুসরণ করলাম।

"মল্লিকা—শোন—"

"না—" বলে মেয়েটি চলতেই থাকল।

তাহলে ঘনশ্যামের বর্ণনা শুনে ঠিকই অনুমান করেছিলাম। এই মেয়েটিই মল্লিকা।

"রাগ করো না মল্লিকা—শোন—"

আমি প্রায় তাকে ধরে ফেললাম, বললাম, "লোকেরা কী মনে করবে—শোন, আমায় মাফ কর—"

মল্লিকা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, আমার দিকে ঘুরে তাকাল। গ্যাসের আলো পড়েই বোধ হয় তার চোখের তারাগুলো ঝকঝক করে উঠল। যেন দুটো হীরা জ্বলছে। আমিও দাঁড়ালাম। কেমন যেন শিরশির করে উঠল আমার সারা শরীর। মল্লিকার ব্যক্তিত্ব আছে বলে কি?

"শঠ—প্রতারক—শয়তান—" মল্লিকা দাঁতে দাঁত চেপে বলল।

"মল্লিকা—ঠাণ্ডা হও—"

"ঠাণ্ডা হব! কেন? আজ যে হঠাৎ চিনতে পারলে? আমি তোমার সর্বনাশ করতে পারি তাই ভেবে?"

"মল্লিকা আমায় মাফ কর—আমার মাঝে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কাউকেই চিনতে পারতাম না—এই হু'বছর আমি বাইরে ছিলাম—"

মল্লিকা আমার দিকে কটমট করে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইল। তার হু'চোখের আগুন যেন এবার নিভে এল, শুধু তাব হু'কানের মুক্তো হুটো চিক্‌চিক্ করতে লাগল। আমি ভুলে গেলাম যে আমি শান্তনু রায়, প্রবীর মজুমদারের ভূমিকায় গল্পে' খাতিরে অভিনয় করার চেষ্টা করছি।

"মাথা খারাপ!" বিড়বিড় করতে লাগল মল্লিকা, যেন নিজের মনেই, বলছে, "এত পাপ করলে মাথা খারাপ হবে না!"

"পাপ!"

"নিশ্চয়—তুমি আমার কত বড় সর্বনাশ করেছ তা জানো?"

"না জানি না—কিন্তু এবার জানতে চাই আমি—আমায় বল মল্লিকা—"

দেখলাম যে চলতে চলতে বিপরীত ফুটে হুটি অল্পবয়সী ছোকরা থমকে দাঁড়াল। আমাদের দেখে বোধ হয় কুতূহলী হয়ে উঠেছে।

আমি বললাম, "চল আমাদের বাড়ীর দিকে হাঁটি—লোকজন দেখছে মল্লিকা—"

"দেখুকগে—"

"চল, ওদিকে চল—আমার বাড়ীতে চল—"

"তোমার বাড়ী! সেখানে যাবার অধিকার আমার আছে? আমি কি প্রবীর মজুমদারের স্ত্রী? সে সম্মান কি তুমি আমায় দেবে?"

কি কঠিন প্রশ্ন! আমি একটু ঢোক গিলে বললাম, "ইয়ে, একটা আলোচনা করা দরকার মল্লিকা—এভাবে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে—"

হঠাৎ মেঘ ডাকল মাথার উপর। বিদ্যুৎ চমকাল কাছাকাছি। চমকে আকাশের দিকে তাকাল মল্লিকা, তারপরে দ্রুতপদে 'মায়া-কুঞ্জে'র দিকে হাঁটতে শুরু করল। আমি সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলাম।

"মল্লিকা—"

মল্লিকা আমার দিকে তাকাল না. বিড়বিড় করতে করতেই হেঁটে চলল, বলতে লাগল, "তোমার বাড়ীর স্বপ্নই তো দেখতাম, ঐ বাড়ীর চারিদিকেই তো দু'বছর ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছি—"

"মল্লিকা—তোমার কী হয়েছে আমি শুনতে চাই—"

"বটে! শুনবে?"

আবার মল্লিকা থামল। ততক্ষণে 'মায়া-কুঞ্জে'র কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। নেপালী দারোয়ানটাকেও দেখা যাচ্ছে।

"হ্যাঁ মল্লিকা—"

"তোমার বাড়ীতে?"

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, "তুমি তো জানো তাতে অসুবিধে আছে—অন্য কোথাও চল কিংবা তোমাদের বাড়ীতে—"

"আমাদের বাড়ী!" মল্লিকা হঠাৎ খিলখিল করে হাসল। সে হাসি আনন্দের নয়, বেদনার। মল্লিকা আবার বলল, "চিনতে পারবে আমাদের বাড়ী? আমাকে তোমার মনে নেই, বাড়ী চিনবে কি করে?"

"ঠিকানা বল—"

মল্লিকা আবার খিলখিল করে হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপরে মেঘের ডাক আবার শোনা গেল। মল্লিকার হাসি আর মেঘের ডাক যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল।

হঠাৎ হাসি থামাল মল্লিকা, বলল, "আমি যাই—"

"বৃষ্টি আসছে—"

"আসুক—আমায় এখুনি যেতে হবে—" হঠাৎ কেমন যেন অস্বাভাবিক মাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠল মল্লিকা, যেন ছটফট করে উঠল, তার চোখের চাউনি আমার ওপর থেকে সরে গিয়ে কি যেন খুঁজতে

লাগল। সে পা বাড়াল।

আমি ব্যাকুল হয়ে বললাম, "ঠিকানা মল্লিকা—কসবায়, কোন্ রাস্তা যেন?"

"কসবার শেষ দিকে, সেই বড পুকুরটা পেরিয়ে—শ্রীধর মুখুজ্জে রোড, ন'য়ের নয় নম্বর—আমি যাই, আর সময় নেই—"

"আমি কাল যাব—বিকেলে—"

"বিকেল নয়—সন্ধ্যে—সন্ধ্যেবেলা এসো—" পেছন দিকে না ফিরেই বলতে বলতে এগিয়ে গেল মল্লিকা।

হঠাৎ বড় বড ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। আমি ছুটে 'মায়া-কুঞ্জে'র, ফটকের কাছাকাছি যেতে যেতে একবার তাকালাম। কিন্তু মল্লিকাকে দেখতে পেলাম না। সে কি ডানদিকের ঐ কানাগলিটাতে ঢুকল? নইলে গেল কোথায়? কিংবা বাঁদিকের ঐ ছোট রাস্তাটায়—কিন্তু সেদিক দিয়ে গেলে তো ট্রাম বাস কিছুই পাবে না, তাহলে?

কিন্তু বৃষ্টিতে প্রায় ভিজে উঠেছি তখন।

দারোয়ান তার কাঠের খুপরির ভেতর থেকে বলল, "সাব আপ তো গিলা হো গিয়া—"

দারোয়ানের দিকে তাকাতেই সে সেলাম করে বলল, "হুজুব ইধর আইয়ে—হাম ছাতা লাতে হৈঁ—"

"নেহি নেহি—" বলে আমি বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই ছুটে কম্পাউণ্ডে ঢুকলাম। গাড়ীবারান্দার দিকে যেতে যেতে দেখলাম যে দোতালার একটি ঘরের জানালার ধারে রমা দাঁড়িয়ে। আমায় লক্ষ্য করছে।

মিকি সগর্জনে অভ্যর্থনা জানাল। ঘনশ্যাম বেরিয়ে এল। কাঞ্চী এল। আমি আমার কামরায় গিয়ে বাতি জ্বাললাম।

পেছু পেছু কাঞ্চী এল।

"ইস, সায়েব যে একেবারে ভিজে গেছেন!"

"হ্যাঁ—" বলে আমি জামা খুলতে শুরু করলাম।

কাঞ্চী একটা তোয়ালে নিয়ে এগিয়ে এল আমার দিকে, "নিন, গা

মুছে ফেলুন—”

তোয়ালেটা নিয়ে বললাম, “তুমি যাও—এককাপ চা নিয়ে এসো—”

“জী সায়েব—” হুকুম পাওয়ায় যেন খুশীই হল কাঞ্চী। সে ছুটে চলে গেল।

জামাকাপড় ছেড়ে বসলাম আরাম করে। বাইরে জোর বৃষ্টির সঙ্গে হাওয়ার মাতন শুরু হল। মল্লিকার কথা মনে পড়ল। সেও নিশ্চয় এতক্ষণে ভিজে গেছে। ঠাণ্ডা না লাগে মেয়েটার। আশ্চর্য, এই তিনবার দেখার পর থেকেই আমি ওর কথা বেশ ভাবছি দেখি!

চায়ের সঙ্গে মিসেস মজুমদারও এলেন।

“এভাবে আর বেরিও না বাবা—ভিজেছ শুনলাম—”

“ও কিছু নয় মা—একটুখানি—”

“ওই একটুতেই অনেক কিছু হয় বাবা—তিল থেকে তাল হয়। একটা এ্যাস্‌পিরিন কিংবা কোডোপাইরিন—”

“আজ্ঞে না—ওসবের দরকার নাই, চা খেলেই ঠিক হয়ে যাবে।”

চা খেতে খেতে হঠাৎ কানে এল বাড়ীর ভেতরে কোথাও পিয়ানো বাজছে। ওপরে। মিসেস মজুমদারের মুখে বিস্ময় ঘনাল।

“বৌমা বাজাচ্ছে! আশ্চর্য, এতদিন বাদে!”

সঙ্গে সঙ্গেই এবার গান শোনা গেল। খুব তীক্ষ্ণ অথচ মিষ্টি গলা। তার সঙ্গে একটা কিছু, যা শরীরে শিহরণ জাগায়, উত্তেজনার সৃষ্টি করে।

গান শোনা গেল ঃ

“কোথারে উধাও হোলো মোর প্রাণ উদাসী
আজি ভরা ভাদরে।
ঘন ঘন গুরু গুরু গরজিছে,
ঝরঝর নামে দিকে দিগন্তে জলধারা,
মন ছুটে শূন্যে শূন্যে অনন্তে অশান্ত বাতাসে।”

গানের মধ্যে একটা বেদনা ছিল, একটা শূন্যতা ছিল, একটি

অন্ধকারে দিকহারা পাখীর কান্না ছিল। তা সত্বেও একটা মাদকতা ছিল। যে মাদকতা রমার উৎফুল্ল যৌবন-সম্ভারের মধ্যে ছিল। বর্ষণমুখর রাতের উতলা হাওয়ায় রমার মিষ্টি সুরের মাদকতা যেন আস্তে আস্তে আমার রক্তের মধ্যেও একটা উদাস আকুলতার সৃষ্টি করল। একটা ব্যাকুলতা যেন ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে আমার হৃদয়কে নিয়ে বর্ষণ-ধারায় অস্পষ্ট, বিদ্যুৎ-চমকে শিহরিত শূন্যতার মধ্যে আর্তনাদ করে বেড়াতে লাগল। এবং মৃত্যুর কথা মনে পড়ল আমার। মৃত্যু কি? কোথায় যায় মানুষ মরবার পর? মৃত্যু কি আলো না অন্ধকার? আমার আগে কত কোটি কোটি সংখ্যাতীত নরনারী মরণের মুখোমুখী হয়ে মাটিতে মিশিয়ে গেচে, আগুনে ছাই হয়েছে—এখনও ফিরে এসে তো বলতে পারল না মৃত্যু কি? মৃত্যুকে আবিষ্কার করার জন্য কি মৃত্যু ছাড়া আর কোনো পথ নেই?

॥ পাঁচ ॥

খানিকবাদে আমি লাইব্রেরীতে গিয়ে দু'একটা ভাল বই পড়ার জন্য বাছতে শুরু করলাম। মিসেস মজুমদার রান্নার তদারক করতে গেলেন। একটা কথা মাথায় এল—এই কদিন ধরে তো এই বাড়ীতে আছি কিন্তু অতিথি সজ্জনদের আনাগোনা লক্ষ্য করলাম না। মিসেস মজুমদার বলেছিলেন বটে যে তিনি মেলামেশা বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু কেন? এত একা একা থাকা কি ভাল? তাছাড়া কেন তিনি প্রবীর মজুমদারের খুন হওয়ার কথা গোপন করে রেখেছেন? তিনি মিথ্যে করেও তো বলতে পারতেন যে প্রবীর কোনো গুরুতর অসুখে বিদেশে মারা গিয়েছে? বোধহয় একবার একটি মিথ্যা কথার সৃষ্টি করে এখন সেই কথাকেই চালু রাখতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে। কিন্তু এ ঠিক নয়, এবিষয়ে কথা বলতে হবে মিসেস মজুমদারের সঙ্গে।

একটা আলমারি থেকে বই বের করে অন্য আলমারির দিকে

ঘুরতে গিয়ে দেখলাম রমা দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। আজ একটু বিশেষ ভাবে সেজেছে সে। খোঁপায় সোনার ফুল, পরনে নাইলনের শাড়ী আর একটা মৃদু সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের ভেতর। মৃদু অথচ উত্তেজক। সেই নাম-না-জানা ফুলের সুবাস নয়। তার চেয়ে অনেক স্থূল। আর কপালের মাঝখানে একটি সিঁদুরের টিপ। কিন্তু কেমন যেন বিসদৃশ মনে হল তা। যেন বিধাতার পরিহাস। অথচ ধবধবে শাদা থানে কি ভাল লাগত রমাকে? এই রাজেন্দ্রানী মূর্তির মহিমা যেন হারিয়ে যেত পৃথিবী থেকে।

"কেমন আছেন ?" রমা একটাও কথা না বলাতে অস্বস্তি লাগছিল। সেই সুদূর অথচ মোহময়ী চাউনি মেলে নিঃশব্দে তাকিয়ে ছিল সে। আমার কথায় সে নড়ে উঠল।

"ভাল। আপনি কেমন আছেন ?"

"আজ্ঞে আমিও ভাল আছি।"

হঠাৎ কাছে এগিয়ে এল রমা। আমি তার দেহের সৌরভ আরো কাছাকাছি পেলাম।

"শুনুন—"

"বলুন—"

"আপনার ডানহাতের কনুইটা দেখি—"

"কেন ?" আমি অবাক হলাম।

"দেখি না—জামার হাতাটা সরান একটু—" রমা'র গলায় আদেশ ধ্বনিত হ'ল।

আমি জামার হাতা গুটোলাম। সব রূপেরই বিশেষ একটি ব্যক্তিত্ব থাকে। অনেক সময় অনিচ্ছাসত্বেও তার কাছে আমাদের মাথা নোয়াতে হয়। আমিও তাই করলাম।

"একটা তিল আছে কনুইয়ের কাছে—না ?" রমা প্রশ্ন করল।

আমি দেখলাম সত্যি একটা তিল আছে আমার কনুইয়ের কাছে।

বললাম, "তাইতো দেখছি।"

রমাও দেখল, তারপর মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল। তার সেই দৃষ্টির ব্যাখ্যা তখন আমি খুঁজে পাইনি, যদিও পরে পেয়েছিলাগ। কী তার ব্যাখ্যা সে যথাসময়েই ব্যক্ত হবে। এখন শুধু এটুকুই বলতে পারি ভাই ভরত যে রমার সেই চাহনিতে বুদ্ধিভ্রংশ করার মত যথেষ্ট সর্বনাশা শক্তি ছিল।

"আশ্চর্য।" রমা উচ্চারণ করল আব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

"কী আশ্চর্য?" আমি মৃদু গলায় প্রশ্ন কবলাম। আমার গলা কেঁপে উঠল। মনে হল যেন তা শুকিয়ে গেছে। খা খা রোদ্দুরে যেমন গলা শুকোয় তেমনি। "কিছু না—আপনাকে ডিস্টার্ব করলাম বলে কিছু মনে করবেন না। আপনার কাজ করুন—" বলেই রমা চলে গেল। সেই রাজহংসীর মত গতিতে।

কেমন যেন একটা অস্থিরতা বোধ করতে লাগলাম। আমি এ কোথায় এসে পড়েছি? এই পুরোন যুগের বাড়ীটার আবহাওয়াতে কেমন যেন সুস্থতা নেই। ঐশ্বর্যের বিকার এখানকার বাতাসে অদৃশ্য সরীসৃপের মত চলাফেরা করছে। শেষে বিপদে না পড়ি। আজ বলতে বাধা নেই যে আমার বয়স তখন অল্প, তখনকার সেই প্রথম যৌবন যেন রমার চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার কানে নানা প্রলোভনের কথা ফিস্‌ফিস্ করে বলতে শুরু করল। আদর্শ, নীতিবোধ, চরিত্র এইসব বড় বড় কথাগুলোকে যেন অসাড় প্রতিপন্ন করার জন্যে আমার রক্তকণিকাগুলোও টগবগ করে ফুটতে আরম্ভ করল। 'আশ্চর্য'! কী আশ্চর্য? আজ নিয়ে দু'দিন একথা বলল কেন রমা?

মন বলল, পালাও।

আর এক মন বলল, পাগল হয়েছ। ক'জনের জীবনে অসাধারণ ঘটনা ঘটে? দেখই না কি হয়।

মন বলল, যদি বিপদ হয়?

আর এক মন বলল, ঐশ্বর্য, রূপ, হয়তো প্রতিষ্ঠাও তোমার সামনে ক্রীতদাসীদের মত একে একে আসবে। সুযোগ ছাড়বে কেন?

মন বলল, এ সব পাপ।

আর এক মন বলল, পৃথিবীতে পাপ আর পুণ্য বলে .কিছু নেই। আর যদি থাকেও তাতেই বা কি যায় আসে? তুমি লেখক, পাপ পুণ্য আশা নিরাশা সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা সব কিছুই ভোগ কর, সব কিছুরই স্বাদ গ্রহণ কর।

মন্ বলল, শয়তান নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য শাস্ত্রের দোহাই পাড়ে।

আর এক মন বলল, শয়তান বলে কিছু নেই, সবই ব্রহ্ম।

মন বলল, সাবধান—সাধু সাবধান।

তারপর কিছুক্ষণ লেখাপড়া করেছি, নিজের অজ্ঞাতসারেও মনের সেই চাঞ্চল্য বর্তমান ছিল বলে মনকে বশ মানাতে পারিনি। তার-পরে খাবার টেবিলে গিয়ে বসলাম। আবার ক'দিন পরে রমা আজ এসে একসঙ্গেই খেতে বসল। খেতে খেতে দেখলাম সে আমার দিকে তাকাবার জন্য খেতেও ভুলে যাচ্ছে। কিন্তু কেন তার দৃষ্টি অমন? সুদূর, বিষণ্ণ? ওকি মেয়েদের একটা চাল। সোজা না তাকিয়ে আড়চোখে লুকিয়ে দেখার মত? স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্? টেবিলের ওপর নানারকমের খাবার। নানা সুঘ্রাণ। কিন্তু সব ছাপিয়ে আর একটি সুঘ্রাণ পাচ্ছি আমি। যুবতী দেহের। স্বাস্থ্যবতী রমণী দেহের।

"ভালো করে খাচ্ছ না যে বাবা?" মিসেস মজুমদারের গলার আওয়াজে আমার চমক ভাঙ্গল। লজ্জা পেলাম। হঠাৎ যেন একটা কাচের বাসন ঝন্‌ঝন্ করে ভেঙ্গে গেল মনের মধ্যে। লজ্জা হল। ছিঃ, আমি কি এতই ঠুনকো! এই পৃথিবীতে পাপই সহজসাধ্য বটে কিন্তু আমি কি এতই সাধারণ যে পাপ করব?

খাওয়ার পালা চুকে গেলে পর আমি লাইব্রেরীতে আবার ফিরে গেলাম ও পিরান্দেল্লোর একটি নাটক বের করে পড়তে বসলাম। বাইরে রাত গভীর হয়ে উঠল, বৃষ্টি থেমে গেল, ঝিঁ ঝিঁ পোকা আর ব্যাঙেরা যেন 'মায়া-কুঞ্জে'র বাসিন্দাদের ঘুম গাঢ় করার জন্য কোরাসে গাইতে লাগল। দূরের পেটাঘড়িতে যখন রাত একটা বাজল তখন

আমার হুঁশ হল। আমি উঠলাম।

শোবার ঘরের আলো নেবানো ছিল, ঢুকতেই খুট্ করে একটা শব্দ হল যেন। বুঝলাম না কিসের শব্দ পুরোন বাড়ী, হয়ত ইঁদুর হবে। সুইচটা দরজার পাশেই, বাতি জ্বালিয়ে টেবিলের দিকে এগোলাম। আবার একটা শব্দ। হয়ত ইঁদুর। টেবিলের ওপর পিরান্দেল্লোর নাটকের বইটা নামাতে গিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম যে টেবিলের ওপর একটি ব্ল্যাক এণ্ড্ হোয়াইট হুইস্কীর বোতল রাখা রয়েছে, পাশে একটি সোডার বোতল, কাচের গেলাস ও বোতল খোলার একটি স্ক্রু।

সত্যি মদ! আমি বোতলটা খুলতেই নিঃসন্দেহ হলাম। কে? কে রেখে গেল? এর অর্থ কি?

আমি নিজের মনেই উচ্চারণ করলাম, "কে? কে রেখে গেল?"

বলতে বলতে দরজার দিকে তাকালাম আমি। থ' হয়ে গেলাম। দরজাটা আর খোলা নেই। সেটি বন্ধ করে তাতে ঠেস দিয়ে, একহাতে আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে সলজ্জ ভঙ্গীতে, হাসি-চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে কাঞ্চী। তারও আজ বিশেষ সা । চুলে হয়ত সাবান মেখেছিল তাই ফুলে ফেঁপে আছে, তা টেনে ঘাড়ের নীচে একটা শাদা সিল্কের ফিতে দিয়ে বাঁধা, বাকীটা আলগা ভাবে পিঠের ওপর ঝুলছে। পাহাড়ী মেয়েদের চুল সাধারণত এত বড় আমি দেখিনি। চুলে বোধ হয় রমার তেলই চুরি করে মেখেছে কাঞ্চী। সেই একই গন্ধ মনে হচ্ছে। চুল বাঁধার পদ্ধতিটুকুও। পরনে একটা পুরোন ঢাকাই শাড়ী, শাদা জমির ওপর খয়েরী রংয়ের বুটি ব্লাউজটা কালো রঙের, পাতলা কাপড়ের—তার তলা থেকে ব্র্যাসিয়ারের রেখা অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই দেখা যাচ্ছে। কাঞ্চী মোহিনী সেজে এসেছে। দেখে আমার আর এক মনের চোখে নেশা ঘনাতে লাগল। কিন্তু এই মদের অর্থ কি?

"তুমি আবার এসেছ কাঞ্চী!"

"হ্যাঁ—" দাঁতে দাঁত চেপে কাঞ্চী অস্ফুটে জবাব দিল।

"এই মদ কে এনেছে ? তুমি?"

"হ্যাঁ—"

"কেন ?"

"আপনি যে খেতেন আগে রাতের বেলা—আমাকেও খেতে দিতেন—"

"তোমাকে !"

আমি দু'পা এগিয়ে গেলাম, তারপরে থামলাম, ভাবলাম। শুনিই না, অতীতের গর্ভ থেকে কি বেরোয় দেখিই না :

বললাম, "আচ্ছা কাঞ্চী, তোমার মেমসাব জানতেন যে তুমি এভাবে এঘরে আসতে ?"

"জানতেন না, তবে সন্দেহ করতেন। আপনি ফিরে আসার পর থেকে আবার আমার ওপর চোখ রেখেছেন।"

"তোমার দেশ কোথায় কাঞ্চী ?"

নেপাল—গাঁয়ের কথা আমার মনে নেই। আমার মা আমাকে পেটে নিয়ে এখানে পালিয়ে এসেছিল এক চা-বাগান থেকে, এই বাড়ীতে সতেরো বছর আয়ার কাজ করে সে মারা গেছে। এই তো বছর আটেক হল।"

"তোমার বাবা কে ?"

"শুনেছি রাজেন চক্রবর্তী বলে একজন চা-বাগানের বাবু।"

"দেখনি ?"

"না। তবে শুনেছি তিনিও খুব সুন্দর ছিলেন।"

"তোমার মা তারপর আর বিয়ে করেনি ?"

"না। মা বাবাকে ভালবেসেছিলেন। তিনি মাকে অস্বীকার করায় মায়ের মন ভেঙ্গে গিয়েছিল, তাছাড়া জাতবেরাদরীদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচবার জন্যই তিনি কলকাতায় নেমে আসেন।"

"কাঞ্চী তোমার মা খুব ভাল ছিলেন মনে হচ্ছে।"

"তিনি সতী ছিলেন।"

"আর তুমি ?" আমি ব্যঙ্গের সুরে প্রশ্ন করলাম।

কাঞ্চী বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মত মুখ তুলল, সতেজে অথচ মৃদুকণ্ঠে বলল, "আমিও সতী—আমি আমার সতীমায়ের মেয়ে। সায়েব, তোমায় দেখে দেখে আমি ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছি, তিল তিল করে অসম্ভব জেনেও আমি তোমায় ভালবেসেছি। আমি জানি আমি এক ঝিয়ের মেয়ে, ঝি, তবু আমি নিজেকে সামলাতে পারিনি। কিন্তু সায়েব, তুমি তো আমার ভালবাসার ইজ্জৎ করোনি।"

"কেন ? তুমি যদি হাবেভাবে ভালবাসা প্রকাশ করো তাহলে সায়েবের দোষ কোথায় ?"

,দোষ নেই ? আজ তাহলে খুলেই বলি। তুমি তো আমাকে ভালবেসে তোমার ঘরে, তোমার বিছানায়, যে বিছানায় আজ তোমার বৌ—"

"সে কবেকার কথা ? মনে পড়ছে না তো—"

"মনে পড়ছে না ? সেই যখন তুমি কলেজে বি-এ পডতে ? মাঠান গেলেন এলাহাবাদে—সেই সময়, আমার বয়স তখন পনেরো, তোমার বিয়ের একবছর আগে। একদিন রাতে তুমি বাইরে থেকে রাত দেড়টায় ফিরে এলে। এক পেট মদ খেয়ে। আমি তোমায় খাবার কথা বলতে গেলাম তোমার ঘরে। তুমি চেয়ারে বসে ছিলে চোখ বুজে। আমি গিয়ে খাবার কথা বলতেই তুমি মাথা ঝাঁকালে, হুকুম করলে তোমার জুতো মোজা খুলে দিতে। আমার রাগ হল কিন্তু ঘনশ্যাম তখন শুয়ে পড়েছে এবং আর সব চাকরেরাও নীচে বলে আমি তোমার হুকুম তামিল করতে বাধ্য হলাম। আমি তোমার জুতো খুললাম, মোজাটা টেনে বার করতে যেতে তোমার পায়ে আমার হাত লাগল। তুমি যেন চমকে চোখ মেলে আমার দিকে ঝুঁকে তাকালে, বললে, 'বাই গড', তোর হাত তো ভারী নরম কাঞ্চী, দেখি তোর হাতটা।' আমি লজ্জায় মাথা নাড়লাম। তুমি জোর করে হাতটা টেনে নিয়ে টিপতে লাগলে আর বলতে লাগলে, 'বাই গড, ইউ আর ভেরী সফ্‌ট্ কাঞ্চী গার্ল—বড় নরম তোর হাত, বাই গড,

ইউ আর ইনডিড ভেরী প্রিটি। তুমি হয়ত ভাবছ যে আমি ইংরেজী কথা মনে রাখলাম কি করে? আমি যে ইংরিজী পড়তে জানি, বুঝিও অনেকখানি। তুমি যখন ছোটবেলায় মেমসায়েবের কাছে পড়তে তখন যে আমি আড়াল থেকে শুনতাম। শুনতাম আর শিখতাম মনে মনে। পরের দিন মেমসায়েব এসে পড়া জিজ্ঞেস করলে আমি যে তোমার চেয়েও চটপট মনে মনে জবাব দিতাম। তারপর তোমার পুরোন বইগুলো আমি কুড়িয়ে কুড়িয়ে নিয়ে যেতাম, যেমন নিতাম তোমার এক আধটা ছবি। সে সবই রাখা আছে আমার বাক্সে। এ বাড়ীতে দিনের পর দিন আমি বড় হয়েছি, তোমাদের দেখেছি দিনের পর দিন, দেখেছি আর শিখেছি। তাই আমার মায়ের মত নেপালী ঢংয়ের শাড়ী পরিনি আমি, গয়না পরিনি, নেপালী ভাষার চেয়ে বাংলাই ভাল জানি আমি—আর জানি ইংরিজী। সে যাই হোক, তারপর তুমি আমার হাত ছেড়ে দিয়ে আমার চুলের ঝুঁটি মুঠো করে ধরে আমার মুখটা তুলে মুগ্ধকণ্ঠে বললে, 'বাঃ—তুই তো বড় সুন্দরী, আজ রাত দেড়টায় নেশা না করে এলে তো তোকে আবিষ্কার করা হতো না। কী সুন্দর রং তোর, তোর নাম গৌরী, বুঝলি কাঞ্চী। তুই হিমালয়ের মেয়ে গৌরী।' বলেই তুমি টলতে টলতে উঠলে, সোজা দরজার কাছে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে। আমি ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়ালাম, বললাম, 'সায়েব আমায় যেতে দাও।' তুমি হাসলে—কিন্তু —কিন্তু কি হবে এসব কথা বলে? এসব তো জানোই—" কাঞ্চী থামল।

আমি বললাম, "না না, থেমো না, বলে যাও কাঞ্চী, তুমি না বললে আমার সব কথা মনে পড়বে না—"

"আমার লজ্জা করছে—"

"হোক লজ্জা, তবু বল কাঞ্চী, আমি সব কথা জানতে চাই—অতীতের সব কথা—তুমি বসবে?"

"না।"

আমি বসে বললাম, "বল কাঞ্চী, তারপর?"

কাঞ্চী সেই একই ভাবে দরজায় ঠেস্ দিয়ে আমার দিকে একবার তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল। আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে তার দুই গাল আর কপোলদেশ রক্তের সলজ্জ উচ্ছ্বাসে রক্তিম হয়ে উঠছে।

মাথা নীচু করে সে আবার বলতে শুরু করল, "আমি বললাম, 'আমায় যেতে দাও সায়েব।' তুমি হাসলে, হেসে নেশায় জড়ানো গলায় একটা ইংরিজী কবিতা বললে। সে কবিতা পরেও শুনেছি আমি অনেকবার। তুমি আমার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে টলতে টলতে এগিয়ে এলে, এগোলে বলতে বলতে—

Come to my arms, cruel and sullen thing ;
Indolent beast, come to my arms again,
For I would plunge my fingers in your mane
And be a long time ur rembering—

তুমি এগোতে লাগলে, তোমার ছায়া এসে আমার ওপর পড়ল আমি পেছোলাম, দরজার দিকে ছুটে গিয়ে সরে খুলতে যাচ্ছি এমন সময়ে তোমার আওয়াজ এল, 'খবর্দার কাঞ্চী, পালালেই গুলি করব।' আমি আস্তে আস্তে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়ালাম, দেখলাম যে মুহূর্তের মধ্যে ড্রয়ার খুলে একটা রিভলবার বের করেছ তুমি, আমার দিকে তার নলটা। আমার ভয় হল, মাতাল মানুষ, হয়ত গুলি করেই বসবে। মরার কথা ভাবতে পারলাম না। তাছাড়া মরব কেন? আমি তো তোমারই কথা ভাবি দিনরাত, তোমারই বুকে মাথা রাখার স্বপ্ন দেখি। শুধু এভাবে চাইনি। কিন্তু সেই মুহূর্তেই আমার জীবনের কথা মনে পড়ল। আমার জন্মের ইতিহাস, আমার মায়ের জীবনের কথা—সব মনে পড়ল যে আমিও একজন ঝি, আমার জীবনে সুখ আর ভালবাসা তো সহজভঙ্গীতে আসবে না। আমার মায়ের জীবনই আমার মধ্যে যেন নতুন করে শুরু হল। আমি ভয়ে ভয়ে তাকালাম তোমার মুখের দিকে। তুমি কঠিনকণ্ঠে ডাকলে, 'আয়, কাছে আয়, তোকে যত দেখছি তত মাথা খারাপ হচ্ছে আমার—বাই গড।' আমি পায়ে পায়ে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে গেলাম, তোমার

কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তুমি আমার দিকে তাকিয়ে হাসলে। যেমন জল্লাদ হাসে তার শিকারকে দেখে, তারপরে হঠাৎ রিভলবারটা টেবিলে রেখে দিয়ে আমাকে বুকে টেনে নিয়ে, মদের গন্ধ-সমেত তোমার মুখ—। আমার ভালবাসার পুরস্কার তোমার কাছে এই-ভাবেই পেয়েছিলাম সায়েব। তারপর মাঠান ফিরে এলেন। এসেই আমার এবং তোমার হাবভাব বুঝতে পারলেন, আমাকে আড়ালে খুব শাসালেন, যদিও ছাড়ালেন না। আমি যে এই বাড়ীরই মেয়ে। তাছাড়া ছেলের কীর্তিকলাপ তিনি জানতেন, দেশী বিদেশী বহু মেয়ের পেছনেই যে তোমার সময় কাটত তাও তিনি জানতেন, তাই বোধহয় ভাবলেন যে আমার টানে যদি ছেলে একটু ঘরমুখো হয়। এ আমার অনুমান। হয়ত আমি ঠিকই বলছি। মাঠানকে যতই ভাল মনে হোক তবু যে তিনি খুব সহজ নন তা তো তুমি জানো। মাঠান আসার পর কিন্তু আমার ওপরে ওঠা মুশকিল হল রাতের বেলা। তাই তুমি পড়াশোনা আর কবিতা লেখার ভাণ করে এই ঘরে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করলে। এখানেই আমাকে ডাকতে তুমি। মাঝে মাঝে একটু একটু মদ খেতে তুমি, আমাকেও অল্প একটু দিতে। তাই আজ ভাবলাম যে হয়ত মদ দেখে তোমার পুরোন দিনের কথা মনে পড়বে, আমায় ডাকবে। তাই আজ চাবি চুরি করে তোমার শোবার ঘরের সেফের ভেতর থেকে একটা বোতল চুরি করে এনেছি। এই দু'বছর যে কী কষ্টে কাটিয়েছি তা যদি জানতে। মাঠান বলতেন যে তুমি রাগ করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছ। জানি না কেন গিয়েছিলে, কিন্তু ফিরে এসে তুমি আর কাউকে চিনতে পারছ না দেখে কি কষ্টই যে পেয়েছি সায়েব। মাঠান বলেছেন যে তোমার মাথা নাকি খারাপ হয়েছে, তুমি নাকি সব ভুলে গেছ, তোমায় নাকি খুঁজে পেতে ধরে এনেছেন। পশুপতিনাথ তোমায় বাঁচিয়ে রাখুন। আমি কিন্তু সায়েব তুমি মেমসাবকে না চেনায় খুশী। কিন্তু আমায় তুমি না চেনায় আমার বুক যে ভেঙ্গে যাচ্ছে। রোজ রাতে আমি না ঘুমিয়ে খালি কাঁদি, খালি কাঁদি সায়েব—"

আমি বললাম, "এবার তুমি একটা বিয়ে কর কাঞ্চী—"

কাঞ্চী সোজা হয়ে দাঁড়াল, যেন একটা বিষধর সাপ ফোঁস করে ফুলে উঠল, আমার দিকে এগিয়ে এসে সে বলল, "খবর্দার—খবর্দার আর একথা বলো না আমি একটু হেসে বললাম, "রাগ করো না—গল্প তোমার শেষ হয়নি, আমায় তুমি সব কথা মনে পড়তে দাও। তারপর—যখন রমা এল এবাড়ী তখন—?" কাঞ্চী খাটের একটা ধারে ঠেস দিয়ে বলল, "মাঠান তোমার মতিগতি দেখে গরীবের ঘর থেকে মেমসাবকে নিয়ে এলেন। কিছুদিন বেশ মেতে রইলো, প্রায় বছরখানেক, তারপর মাসকয়েক পরেই তুমি যে কে সেই হলে। আবার বাইরে যাতায়াত, আবার এই ঘরে আমাকে আদর করতে শুরু করলে। এক বছর আমি পাগলের মত ছটফট করেছি, তুমি না চেনার ভাণ করেছ, মাঠান আমায় আড়ালে শাসিয়েছেন। কিন্তু তুমিই ফিরে এলে আমার টানে, বলতে, 'হিমালয়ের 'নে ফিরে এলাম গৌরী, তুই অদ্ভুত মেয়ে।' কিন্তু আমি জানতাম তোমাকে, এ সবই মন জেতার জন্য। সে বিষয়ে তোমার জুড়ি কেউ ছিল না। তারপর মেমসায়েব সন্দেহ করতে শুরু করলেন। মাঠান আমায় তাঁর এক ভাইয়ের বাড়ী, সেই এলাহাবাদে পাঠিয়ে দিলেন। তার ক'মাস বাদে শুনলাম যে তুমি কোথায় গেছ তা কেউ জানে না। আবার ফিরে এলাম এখানে। এই ঘরে কতবার এসেছি, ঐ বিছানা ছুঁয়ে ছুঁয়ে তোমার কথা কত ভেবেছি—"

"আর রমা? সে কি করত?"

"সে কথা তাঁকেই জিজ্ঞেস কোরো সায়েব—আমায় কেন?"

হঠাৎ মৃদু মদের গন্ধ পেলাম। কাঞ্চীর দিকে তাকালাম।

"কাঞ্চী—তুমি কি মদ খেয়েছ?"

"হ্যাঁ—একটু গিলেছি।"

"কেন?"

"নইলে এত কথা বলতাম কি করে? শোন সায়েব, ঐ জয়ন্তবাবুর ওপর একটু নজর রেখো, আর তোমার—তোমার—" কাঞ্চী থেমে গেল।

"থামলে কেন ?"

"তোমার বৌয়ের ওপর নজর আছে জয়ন্তবাবুর।"

"বটে! একথা কি করে জানলে তুমি ?"

"মেয়েদের এসব কথা বুঝতে দেরী হয় না। মাঠানও বুঝতে পেরেছেন—"

"তাহলে তিনি জয়ন্তকে এবাড়ীতে আসতে নিষেধ করেন না কেন ?"

"জানি না।" কাঞ্চী মুখ তুলে তাকাল, একটু হেসে বলল, "মেমসায়েব তোমায় ওপরে যেতে বলেননি ?"

"এসব কথা কেন ?"

"আহা শুনিই না সায়েব—আমার সঙ্গে তো হাসিঠাট্টা করতে তুমি—"

"ওসব কথা থাক কাঞ্চী—" আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

কাঞ্চী গম্ভীর হয়ে বলল, "আমি জানি মেমসায়েব আমার মত পাগল নয় তোমার জন্য—তাই বলছি, জয়ন্তবাবুর ওপর নজর রেখো। আমি অবশ্য এতেই খুশী, আমি তো এই-ই চাই—"

"কি চাও ?"

"চাই যাতে তুমি শুধু আমার থাকো—"

কাঞ্চীর দিকে আবার ভালো করে তাকালাম। তার চোখে তার বাসনার প্রকাশ কী উদগ্র ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে! হঠাৎ দূরের কোনো পেটা-ঘড়িতে দুটোর ঘণ্টা বাজল। আমি কাঞ্চীকে দেখে ও নিজের মনকে যাচাই করে ভয় পেলাম। বাইরে বর্ষণ-ক্ষান্ত বাসনাময়ী রাতের অন্ধকার ক্রমেই আরো রহস্যময় হয়ে উঠছে। ঘরের ভেতর বাসনাতুরা একটি যুবতী মেয়ে। তার রক্তে মদের উত্তেজনা, তার দু'চোখে অবৈধ ভালবাসার আগুন। আর আমার প্রথম যৌবন লজ্জাকে লাথি মেরে দূর করার জন্য টেবিলেও ওপর হাতছানি দিচ্ছে মদের বোতল। শুধু একটি ইঙ্গিত, শুধু সুইচে একটি আঙুল রাখলেই আদিম রিপুর উন্মত্ততা অন্ধকারে আত্মপ্রকাশ করবে। বিশ্বাস কর

ভরত, আমি ঘামতে শুরু করলাম। আমার সেই আরেক মন আস্তে আস্তে যেন আমার মনের গলা টিপে ধরল।

সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চী ছুটে এসে আমার বুকে পড়ল, আমায় দুহাতে সবলে পেষণ করতে করতে আমার বুকে গলায় চুমু খেতে লাগল, মাথা খুঁড়তে লাগল আর মদের গন্ধ-মেশানো কান্নার সুরে বলতে লাগল, "নিষ্ঠুর, তুমি এখনো না-চেনার ভাণ করবে? এখনো সাধু সেজে থাকবে? সায়েব, তুমি সেই কবিতা বল না, বল না দুহাত বাড়িয়ে—বল—বল—"

আমার চৈতন্য তখন বিলুপ্ত হতে চলেছে। শয়তান তখন আমার মনকে মল্লযুদ্ধে হারিয়ে বিপর্যস্ত করেছে। ঠিক সেই সময়, সেই সুন্দরী পর্বত-দুহিতার উষ্ণ আলিঙ্গনে নীতিগতভাবে নিজেকে যখন অতি হীন প্রমাণিত করতে যাচ্ছিলাম, যখন আমার মস্তিষ্ক আমার সমস্ত শিরা-উপশিরা ও স্নায়ুযন্ত্রগুলোকে একটি চরম নির্দেশ দিতে যাচ্ছিল ঠিক তখুনি একটি দম্‌কা হাওয়া ঢুকল ঘরের ভিতর। ভিজে ও ঠাণ্ডা সেই হাওয়ায় শরীর কেঁপে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বাগানে একদল পাখী কেন জানি না চেঁচিয়ে উঠল আর কাঞ্চীর দেহসৌরভ ছাড়িয়েও আর একটা গন্ধ পেলাম। সেই নাম-না-জানা ফুলের সুবাস। হঠাৎ মনটা কেমন যেন হয়ে গেল। হঠাৎ মনে হল এর চেয়ে মৃত্যু ভাল, মৃত্যু এর চেয়ে অনেক বেশী মহৎ ও উত্তেজক। কেন মনে হল জানি না, অন্তত তখন জানতাম না। সেই ফুলের সুবাস আমায় এক মুহূর্তে বিবশ করে তুলল আর বাইরে যেন কোথাও একটা বেড়াল কেঁদে উঠল। যেন কোনো ছোট মেয়ে কাঁদছে।

আমি কাঞ্চীকে সবলে ঠেলে দিলাম। সে আমার বিছানার ওপর পড়ে গেল, সবিস্ময়ে, অভিমানভরা দৃষ্টি মেলে তাকাল।

আমি ছুটে দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুলে বললাম, "যাও, ঘরে যাও কাঞ্চী—আমি প্রবীর মজুমদার নই—"

কাঞ্চী পাগলের মত চাপা ও হিংস্র গলায় বলল, "না, আমি যাব না—তুমি মিছে কথা বলছ, মিথ্যাবাদী, নিষ্ঠুর—"

"কাঞ্চী—"

"না—"

হঠাৎ একটা ডাক ভেসে এল, "কাঞ্চী—ও কাঞ্চী—"

চমকে উঠলাম। পাথর হয়ে গেলাম। কাঞ্চীও। সে একলাফে উঠে দাঁড়াল, বিবর্ণ হয়ে গেল ও কাঁপতে লাগল।

সে বিড়বিড় করে বলল, "মেমসায়েব!"

ঠিক। রমারই গলা বটে। এবার একটা সুইচ টেপার শব্দ শোনা গেল। বোধ হয় ড্রয়িংরুমের বাতি জ্বালল।

"কাঞ্চী—" আবার ডাক শোনা গেল।

উদ্গত একটা কান্নার শব্দ চাপতে চাপতে হঠাৎ কাঞ্চী দরজার দিকে ছুটে গেল, মুহূর্তের মধ্যে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার ঠোঁটে তার তপ্ত দুই ঠোঁট ছুঁইয়েই পরমুহূর্তে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আমি হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। শব্দ পেলাম যে ড্রয়িংরুমে রমা কি যেন বলল কাঞ্চীকে। তারপর পায়ের শব্দ। চাপা কান্নার শব্দ। বোধ হয় কাঞ্চীর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তা থেমে গেল। রাত গভীর, সেই গভীরতার মধ্যে সেই কান্না যেন একটা ছোট্ট বুদ্বুদের মত মাথা চাড়া দিয়েই আবার মিলিয়ে গেল। তারপর সুইচ টেপার শব্দ। বোধ হয় বাতি নিভল। হালকা হাওয়ার শব্দের মত পায়ের শব্দ। তারপর সব নিঃশব্দ। শুধু বাইরে অশ্রান্ত ঝিঁঝিঁর ডাক। আশ্চর্য, এসব কী ঘটে গেল!

আমি ঘরের ভেতরে তাকালাম। টেবিলের ওপর কাচের গেলাস আর মদের বোতল। কাঞ্চীর বাসনা। প্রবীর মজুমদারের পাপ। আমি আমার ঠোঁটে হাত দিলাম। এখনো একটা নরম ও তপ্ত স্পর্শ যেন লেগে আছে। আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দরজা বন্ধ করে বাথরুমের দিকে এগোলাম। মুখটা ধুতে হবে। কাঞ্চীর স্পর্শ মিটিয়ে ফেলতে হবে। ও তো আমার উদ্দেশ্যে ছিল না, ও ছিল পাপিষ্ঠ প্রবীর মজুমদারের উদ্দেশ্যে একটি বাসনাতপ্ত অর্ঘ। ওতে আমার অধিকার

নেই। লোভ একটু হয়েছিল বটে! আমার অল্পবয়স, বর্ষারাতের মোহ, কাঞ্চীর লোভনায় যৌবন। হয়ত বিপদেই পড়তাম—ভগবানকে ধন্যবাদ যে আমি নীচে নামিনি। এমন ভাবার সঙ্গে সঙ্গেও কিন্তু একটা মন হায়-হায় করতে লাগল। কী লজ্জার কথা! আর মুখটা ধুতে ধুতে হঠাৎ মনে হল যে সেই নামহীন ফুলের গন্ধটা যেন এখনো ঘরের মধ্যে আছে। কোন্ ফুল? জানালার ধারে কোনো কিছু নাকি? না তো। হঠাৎ মনে পড়ল, হঠাৎ মাথায় এল। কী আশ্চর্য! যতবার মল্লিকার সঙ্গে দেখা হয়েছে ততবারই যেন, এই গন্ধ পেয়েছি! মল্লিকার কথা মনে আসতেই তার মুখটা যেন আমার চোখের সামনে হাওয়ায় ভাসতে লাগল। বড় মেজাজী মেয়েটা। কিন্তু তার সেই মেজাজটিই যেন মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। মল্লিকার কথা ভাবতে ভাবতে আমি ভুলে গেলাম যে এই খানিক আগেই কতবড় একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল। আমি ভুলে গেলাম কাঞ্চীর জীবন-বৃত্তান্ত, ভাবলাম না রমা কি করে এল, কি বলল কাঞ্চীকে? বাতি নিভিয়ে বিছানায় শোবার আগে আবার হঠাৎ মৃত্যুর কথা মনে এল আমার। ভাবলাম মানুষ মরে কেন? ভাবলাম মৃত্যু কেমন? মৃত্যু কি অন্ধকার?

॥ ছয় ॥

পৃথিবীতে সব কিছুর মধ্যেই একটা গতি আছে ভরত, একটা বেগ আছে। সব কিছুই হয় কমে নয় বাড়ে। জোরে ছোটে কিংবা আস্তে চলে। শুরু হয় কিংবা শেষ হয়। তেমনি গল্পেরও একটা গতিবেগ আছে। সেই গতিই তার প্রাণের লক্ষণ, সেই গতিবেগের জন্যই তা চিত্তাকর্ষক হয় এবং হয় না। যে গল্পে গতি নেই তা গল্প নয়। যে গল্পের মধ্যে আমিও একটি মুখ্য চরিত্র হয়ে যুক্ত হয়েছিলাম সেই রাতের পর থেকে সেই গল্পের গতিবেগ আচমকা বৃদ্ধি পেয়ে গেল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর চা এল। কিন্তু আজ কাঞ্চী এল

না, এল বলবীর। কেন এল না কাঞ্চী সে কথা বলবীরকে জিজ্ঞেস করতে সঙ্কোচ হল, তবে অনুমান করতে অসুবিধে হল না যে কাঞ্চীকে রমা আসতে নিষেধ করেছে। কিংবা কাঞ্চীই হয়ত লজ্জায়—

মিসেস মজুমদার এলেন। তাঁর মুখটা গম্ভীর কিনা বুঝতে পারলাম না। রাতে ভালো ঘুম হয়নি বলে শরীরে জড়তা ছিল, তাই কোনো কথা খুঁজে পেলাম না। চা খেতে খেতে লক্ষ্য করলাম যে মিসেস মজুমদার আমার টেবিলের দিকে তাকিয়ে আছেন। সেদিকে তাকাতেই চমকে উঠলাম—ছি ছি ছি, মদের বোতলটাকে আমি সরিয়ে রাখিনি!

মিসেস মজুমদার আমার দিকে তাকালেন, তাঁর চোখে যেন প্রশ্ন দেখতে পেলাম, বললাম, "কাল রাতে কেউ এনে ওখানে ওগুলো রেখে গেছে, ভেবেছে আমি খাই।"

মিসেস মজুমদার আমার মুখের ওপর থেকে নজর সরিয়ে নিয়ে বললেন, "আমি জানি তুমি সব কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছ। আমি রমার কাছে সব শুনেছি।"

আমি একটু শংকিত হয়ে বললাম, "কিন্তু এতে কাঞ্চীর তো কোনো দোষ নেই মা—ও ভেবেছে আমি প্রবীরবাবু এবং—"

মিসেস মজুমদার বিষণ্ণকণ্ঠে বললেন, "জানি বাবা, আমি যে মিথ্যে কাহিনী তৈরী করেছি আজ তারি ফল ফলছে—কোনোদিন তো ভাবিনি যে তোমায় পাব—"

"কিন্তু আজ এই মিথ্যেকে জীইয়ে রেখে লাভ কি?"

"আত্মসম্মান—ও নিয়ে কিছু বোলো না বাবা—আমিও ভাবছি।"

"বরং এ ভাবনা শেষ করে দিন—আমি চলে যাই!"

"ওকথাও বোলো না বাবা—"

চুপ করে রইলাম। তখন যদি আত্ম-বিশ্লেষণ করতাম তাহলে হয়ত বুঝতে পারতাম যে আমি ক্রমেই জড়িয়ে পড়ছি, আমি 'মায়া-কুঞ্জে'র মায়ার ফাঁদে পা দিচ্ছি। কিন্তু মায়ামুগ্ধ না হলে এ সংসারে গল্প তৈরী হবে কি করে?

একটু থেমে জিজ্ঞেস করলাম, "কাঞ্চীকে কিছু বলেছেন ?"

"ওকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়েছি—"

আমি চমকে উঠলাম, "কোথায় ? ছাড়িয়ে দিলেন নাকি ?"

মিসেস মজুমদার মাথা নাড়লেন, "না, ছাড়াব কেন ? সেই কবে থেকে আছে, মা-মরা মেয়ে, এ বাড়ীর মেয়ে বললেই হয়। ওকে পাঠিয়ে দিলাম এলাহাবাদে, আমার দাদার ওখানে থাক্ কিছুদিন।"

"এই সকালেই পাঠিয়েছেন ! গাড়ীতো—"

"তা হোক, রমা, আর এক মিনিটও ওকে সইতে পারছে না—" বলেই মিসেস মজুমদার থেমে গেলেন, তারপর উঠে বললেন, "এসব নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না বাবা, তোমার কাজ তুমি করে যাও, আমি তোমার মঙ্গল দেখে শান্তি পাই—"

তিনি চলে গেলেন আমায় নিশ্চিন্ত হতে বলে। কিন্তু আমি চিন্তা করতে শুরু করলাম নতুন করে। রমার আক্রোশের কারণ বুঝি; কিন্তু সেই আক্রোশ এতদিনে সবাক হয়ে প্রকাশিত হল কেন ? প্রবীর মজুমদারের ভয়ে বুঝি সে কিছু বলতে পারত না ? এত ভয়ের কি ছিল ? দূর হোক ছাই, এসব ভেবে তো কূলকিনারা করতে পারব না, তার চেয়ে দেখে যাই কি হয়। দেখি আজ মল্লিকার সঙ্গে দেখা করে নতুন কি জানতে পারি। মল্লিকার কথা মনে আসতেই মনটা কেমন স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। কিন্তু হায়, কোনো কিছু জানতে গেলে যে আমাকে প্রবীর মজুমদার সাজতে হবে। মন বলল, ক্ষতি কি, অনেকে রঙ্গমঞ্চের ক্ষুদ্র পরিধিতে ভালো অভিনয় না করতে পারলেও জীবনের বিশাল রঙ্গমঞ্চে সুদক্ষ অভিনেতাদেরও হার মানাতে পারে, অতএব এগিয়ে যাও।

গেলাম তাই। বেরোলাম অবশ্য দুপুরেই। পাটনার এক ছোটবেলার বন্ধু কদিন আগে রেডিওতে একটা চাকরি পেয়ে কলকাতায় এসেছে, তারই সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। অমিয়কে তোর মনে আছে তো ভরত ? সেই যে অমিয় চৌধুরী—যে খুব চালিয়াতী করে বেড়াত

অথচ যার হৃদয়টা একেবারে শিশুর মত উদার! সেই অমিয়।

অমিয়ের সঙ্গে দেখা করে, আড্ডা দিয়ে আমি যখন বেরোলাম তখন বিকেল পার হয়ে গেছে। ট্রামে প্রায় চেপ্টেও প্রাণে বেঁচে লেক রোডের মোড়ে এসে এক সময়ে নামলাম। এলোমেলো হেঁটে যখন সন্ধ্যার আলো রাস্তায় জ্বলে উঠল তখন কসবার দিকে রওনা হলাম। মল্লিকা সন্ধ্যেবেলাই যেতে বলেছিল যে, তাই আগে যেতে কিছুতেই ভরসা হল না। হয়ত থাকবে না সে বাড়ীতে, সুতরাং আগে গিয়ে কি হবে?

কসবার দিকে পৌঁছে শ্রীধর মুখুজ্জে রোড খুঁজে বের করতে প্রায় মিনিট দশেক লাগল। তারপর একে ওকে জিজ্ঞেস করতে লাগলাম ন'য়ের নয় নম্বরের বাড়ীটার জন্য।

"ভদ্রলোকের নাম কি?" একজন প্রশ্ন করলেন।

বলতে পারলাম না। এমন কি মল্লিকার উপাধি কি তাও জিজ্ঞেস করিনি তাকে।

"এগিয়ে যান একটু—"

হঠাৎ মনে পড়ল যে একটা পুকুরের কথা বলেছিল মল্লিকা। বললাম, "ওদিকে একটা পুকুর আছে দাদা?"

"পুকুর! তা একটা আছে বটে কিন্তু সেদিকটায় তো জঙ্গল—আচ্ছা এগিয়ে যান—সোজা গিয়ে ডানহাতি—' সোজা কিছুটা এগোতেই দেখলাম যে বসতি আর ঘন নেই। একটা বাড়ীর পরেই কিছুটা ফাঁকা, আবার একটা বাড়ী, তারপর খানিকটা বাগান। এমনিভাবে রাস্তাটা ডানহাতি বাঁক নিল। সেখানে একটা মুদির দোকান। দোকানের পাশ দিয়ে বাঁদিকেও একটা রাস্তা গেছে। ডানহাতি রাস্তাটা ধরে এগোতেই দুটো একতলা বাড়ীর পরে কয়েকটা কুঁড়েঘর মত দেখলাম। বোধহয় রিফিউজীদের আড্ডা হবে। সেখানে একটা তেলেভাজার দোকান। টাকমাথা একটি লোক নিজের মনে ফুলুরি ভেজে চলেছে। দোকানে কিন্তু লোকজন নেই। দূর থেকে একটা হারমোনিয়মের শব্দ ভেসে আসছে। অত্যন্ত মামুলি একটা গৎ

বাজছে। যে বাজাচ্ছে সে নির্ঘাৎ একমাসের বেশী বাজাতে শেখেনি।

আমি সেই টাকমাথা ফুলুরিওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলাম, "ন'য়ের নয় নম্বর বাড়ীটা কোথায় বলতে পারো ভাই?"

টাকমাথা মুখ তুলল না, বলল, "আমায় 'তুমি' বোলো না।"

আমি হাসলাম, "কিন্তু আমায় যে 'তুমি' বলছেন?"

"সে আপনি 'তুমি' বললেন বলে।"

"তা ঠিক—ন'য়ের নয় নম্বর বাড়ীটা—"

"শুনেছি—এবার বাঁহাতি একটা পুকুর পড়বে—তারই উত্তর দিকে। ওদিকে একটাই বাড়ী, বাইরে শিউলিগাছ আছে।"

"ধন্যবাদ—"

"হয়েছে—আমি সায়েব নই।" লোকটি মাথা না তুলেই বলল।

হেসে এগিয়ে গেলাম। দু'পা এগোতেই বাঁদিকে একটা মজা পুকুর দেখতে পেলাম বটে। তখন অন্ধকার হয়েছে, কিন্তু আকাশে একফালি চাঁদও উঠেছে। পুকুরের উত্তর দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে ছোট্ট একটা একতলা বাড়ীও রয়েছে বটে। ভেতরে আলো জ্বলছে। এগিয়ে গেলাম। শিউলিগাছও আছে বটে বাইরে। দেয়াল নেই কিন্তু বাঁশের বেড়া আছে, তাতে মাধবীলতা। পুরোন বাড়ী। ভেতরে কে যেন গুণগুণ করে গাইছে। মেয়ের গলা। ভারী মিষ্টি গলা। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মত মনে হল, কিন্তু কথা বুঝতে পারলাম না।

মল্লিকা গাইছে নাকি?

আমি কড়া নাড়লাম।

ভেতরে গুণগুণানি বন্ধ হয়ে গেল।

একটি বয়স্কা মহিলার মৃদু ডাক শোনা গেল, "দেখতো মল্লি কে এল—"

"যাই মা—" মল্লিকার গলা শোনা গেল।

সঙ্গে সঙ্গে মৃদু বিলাপের মত একটা ঝিরঝির হাওয়া উত্তর দিক থেকে এল আর তাতে সেই অজানা ফুলের সুবাস।

দরজার ও-পিঠে চুড়ির শব্দ হল, সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন, "কে?"

"আমি—"

"আমি কে ?"

"আমি—" একটু ইতঃস্তত করে বললাম, "প্রবীর—"

দরজা খুলে গেল ধীরে ধীরে। ঘরের ভেতরে একটা হ্যারিকেন জ্বলছিল, মল্লিকার পেছন দিকে, ভেতরের দরজার কাছাকাছি একটা টেবিলের ওপর। তাই মল্লিকার মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম না। কিন্তু চোখ দুটো তার যেন আকাশের দুটো তারার মতই জ্বলজ্বল করছে।

"এসো—" মল্লিকা ডাকল। তার গলাটা মোলায়েম।

ভেতরে ঢুকলাম। ঘরের দেয়ালে চূণকাম অনেকদিন হয়নি মনে হচ্ছে কিন্তু তবু বেশ সাজানো, সর্বত্র একটি সুরুচির ছাপ। দুটো পুরোন চেয়ার, দুটি মোড়া, টেবিল, ছোট একটি টিপয়, দরজা জানালায় সস্তা কাপড়ের পরদা, দেয়ালে খানচারেক ছবি—দুটি রাধাকৃষ্ণ আর মা কালীর, বাকী দুটি হয়ত ফুটপাথে কেনা প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী। একটা দেয়াল-আলমারিতে খানকতক বই আর কয়েকটা মাটির পুতুল।

"বোস।"

বসলাম।

"কি দেখছ অমন করে—যেন প্রথম দেখছ এই ঘর ?" মল্লিকা ব্যঙ্গের সুরে বলল।

জবাব এড়িয়ে তার দিকে তাকালাম। সাধারণ একটা তাঁতের ডুরে শাড়ী পরেছে সে কিন্তু কী সুন্দর মানিয়েছে তাতেই! পরিপাটি করে খোঁপা বেঁধেছে, তাতে একটি গন্ধরাজ ফুল। তাহলে কি এই ফুলেরই গন্ধ পাই আমি ? কিন্তু তাতো নয়। তবে ?

"তোমার গা থেকে একটা গন্ধ বেরোচ্ছে—কোন্ এসেন্স ?"

"আমি তো এসেন্স মাখি না—"

"তাহলে ? তুমি এলেই একটা গন্ধ পাই যে ?"

মল্লিকা ঝকঝকে দাঁত মেলে হাসল। কি জানি কেন হাসিটাকে মুহূর্তের জন্য নকল মনে হল কিন্তু এমন মিষ্টি ছিল সেই হাসি যে

পরমুহূর্তেই সব কথা ভুলে গেলাম তার পরিহাস-তরল কথায়।

সে বলল, "মহাভারতে মৎস্যগন্ধার গল্প পড়নি? আমি তেমনি এক মেয়ে, তবে তার চেয়ে অনেক ভাল—আমি পদ্মগন্ধা।"

আমি হেসে বললাম, "তা ঠিকই বলছ, ঠাট্টা নয়। কিন্তু তুমি যখন আসো না, তখনো আজকাল ঐ গন্ধটা পাই কিন্তু—আশ্চর্য।"

মল্লিকা বলল, "আশ্চর্য কেন? চোখে দেখা না গেলেও আমি যে তোমার চারপাশে ঘুরি আজকাল—"

বললাম, "তাও ঠিক, আমার মনে ঘুরছ বটে—"

"বটে! তাহলে এতদিনে চিনতে পেরেছ? আবার নেশা হচ্ছে বুঝি?"

আমি হাসলাম। জবাব দিলাম না, কারণ তা নিরাপদ নয়।

মল্লিকা আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল। সে যেন তার দু'কানের জ্বলন্ত মুক্তোর মতই দুটো চোখে এক বিচিত্র জ্বালা নিয়ে আমায় মনে মনে বিচার করতে লাগল।

"কি দেখছ মল্লি?" আমি গলা নামিয়ে প্রশ্ন করলাম।

"মল্লি!" মল্লিকা চমকে উঠল, "তুমি তো আমায় ও-নামে কোনো-দিন ডাকোনি—তুমি ডাকতে আমায় 'মলি' বলে।"

"মল্লি নাম অনেক ভালো।"

"বটে! কিন্তু আগে যে অন্য কথা বলতে!"

"তা হোক, মানুষ কি বদলায় না?"

"বটে! বদলায়!"

"মল্লি, তুমি আমার ওপর এত রেগে আছ কেন?"

"বটে! ন্যাকা সাজছ—শয়তান—" মুহূর্তের মধ্যে তার চোখের তারাতে আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখতে পেলাম, টেবিলের ওপরকার লণ্ঠনটা যেন হঠাৎ দপ্ দপ্ করে উঠল।

আমি উঠে দাঁড়ালাম, "মল্লিকা!"

"চুপ্—চুপ্ করে বোসো, আজ তোমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া আছে আমার—"

"বেশতো, বোঝাপড়া করো, বলো আমি কি করেছি। তুমি উত্তেজিত হচ্ছ কেন? মল্লিকা—মনে হচ্ছে তুমি যেন পারলে খুন করবে?"

মল্লিকা সেই আগের মত ভঙ্গীতেই বলল, "হ্যাঁ, হয়ত খুনই করব তোমায়—"

"বেশ কোরো—আগে বল আমি কি করেছি—"

"বলছি—কিন্তু এখানে নয়। বাড়ীতে মা আর বাবা দু'জনেই আছেন—"

"বাবা আজকাল কি করেন?"

"আজকাল কিছুই করেন না, তুমি জানোই তো যে অনেকদিন ধরেই কিছু করেন না—সেই মার্চেণ্ট অফিস থেকে বরখাস্ত হবার পর তাঁর মন ভেঙ্গে গেছে, তাছাড়া হাঁপানী। মায়ের শরীরও ভাল নয়। সর্বোপরি অভাব—সেই অভাবের সুযোগই তো তুমি নিয়েছিলে—"

"মল্লিকা—"

"কি?"

"আর কেউ নেই তোমার? ভাই-বোন?"

মল্লিকা যেন একটু অবাক হল, বলল, "আজ যেন নতুন মানুষের মত কথা বলছ তুমি! আমার ভাই-বোন কেউ থাকলে তোমার খপ্পরে পড়ি? দূর সম্পর্কের এক ভাই ছিল, সেই তো তোমায় এনে দিয়ে গেল ভেট হিসেবে, সেও কি কম শয়তান—"

"কে সে? মানে কার কথা বলছ বলত?" আমি উৎসুক হয়ে উঠলাম।

মল্লিকা ঘাড় বেঁকিয়ে আমার দিকে তাকাল, বলল, "ন্যাকা সাজছ! বটে! চল তোমায় বোঝাচ্ছি—"

আমি হাসলাম, "কোথায় যাব?"

"এসো আমার সঙ্গে—বাইরে। এখানে মা বাবা শুনতে পাবেন।"

"তোমার মা বাবার সঙ্গে একবার দেখা করলে হত না?"

"না। তাঁরা জানেন না যে তুমি এসেছ, জানলে তোমার কপালে

আরো দুর্গতি আছে। এসো আমার সঙ্গে—”

সে দরজার দিকে এগোল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত তার পেছু ধরলাম।

দরজা বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিতে গিয়ে মল্লিকা চেঁচিয়ে বলল, “মা, আমি দশ মিনিটে যমুনাদের বাড়ী থেকে আসছি—”

মায়ের গলা ভেসে এল, “তাড়াতাড়ি আসিস—”

“হ্যা মা—”

দরজা ভেজিয়ে বাইরের দিকে চলল মল্লিকা। বেরিয়ে বাড়ীর পাশ দিয়ে একটা পায়ে-হাঁটা পথ ধরে এগোল। আমি নিঃশব্দে তার অনুসরণ করতে থাকলাম। মল্লিকার রাগ, তার উত্তেজনা, তার রূপকে যেন বহ্নিশিখার মত বর্ণোজ্জ্বল করে তুলেছে, আমি মুগ্ধ পতঙ্গের মত সেই বহ্নিশিখার নিঃশব্দ নির্দেশে চলতে লাগলাম। শুধু পায়ের নীচে লতাপাতার শব্দ উঠতে লাগল। বাড়ীটা ছাড়িয়ে পেছন দিকে একটা ছোট্ট আমবাগান। আলো আঁধারিতে মায়াময়। তারি ভেতর দিয়ে মল্লিকা চলল। সেই ছন্দোময় গতিতে, যেন হাওয়ায় ভর দিয়ে হাঁটছে সে। একবারও পেছন ফিরে তাকাল না সে। আমিও যেন কথা বলতে গিয়ে আর কথা বলতে পারলাম না, জিভ যেন সরল না। ভাবলাম, থাক না, কি হবে প্রশ্ন করে? দেখি না, কোথায় গিয়ে থামে এই আশ্চর্য রূপসী মেয়েটি!

বাগান পার হয়ে উঁচু নীচু জমি শুরু হল, একটা বিলের মত জায়গায়। এখানে গুঁড়ো পানা জমে আছে, ওখানে বড় বড় ঘাসের বন। তার মাঝখান দিয়ে সংকীর্ণ পথ।

মল্লিকা থামল, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল আমার দিকে, প্রশ্ন করল, “মনে পড়ে?”

“কি?”

“কি? কিছুই মনে নেই? এদিকে আমরা মাঝে মাঝে নিরিবিলিতে কথা বলতে আসতাম না?”

“তা বটে!”

“তা বটে! মনে নেই, এখানে তোমার ইংরিজী কবিতা এবং

আরো কত বিদেশী কবিতা শোনাতে! দু'হাত বাড়িয়ে আজ বলবে নাকি?

Come to my arms, cruel and sullen thing;
Indolent beast, come to my arms again—

বলতে বলতে খিলখিল করে হেসে উঠল মল্লিকা।

সে হাসি আমার কানের পাশে, আমার চারদিকে যেন অনেকক্ষণ ধরে বাজতে লাগল এবং আমি উপলব্ধি করলাম যে প্রবীর মজুমদার কবিতার সাহায্যে নারীচিত্ত জয় করার পদ্ধতিটা প্রায় সর্বক্ষেত্রেই সমানহারে প্রয়োগ করত। মেয়েরা স্বভাবতই কি আবেগপ্রবণ?

"কি হল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এসো—"মল্লিকার ডাক এল।

"চল—"

মল্লিকা আবার এগোল। আমি তার পেছনে। এঁকে বেঁকে সরীসৃপ গতিতে। দূরে একটা জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। বহুদূরে, বাঁদিকে কতগুলো আলো আর কতকগুলো বাড়ীর আভাস। আমার কি জানি কেন তখন আর কোনো খেয়াল নেই।

হঠাৎ একটা ঢিবির আড়ালে মল্লিকা অন্তর্ধান করল। আমি এগিয়ে তাকে দেখতে পেলাম না।

"তুমি কোথায় মল্লিকা?"

"এগোও—সামনে—" মল্লিকার গলা শোনা গেল।

আমি এগোলাম আর সঙ্গে সঙ্গে কাদার মধ্যে পড়ে গেলাম। উঠবার চেষ্টা করতেই সবিস্ময়ে ও সভয়ে উপলব্ধি করলাম যে আমি ক্রমেই কাদায় নেমে যাচ্ছি। উঠবার চেষ্টা করলাম, পারলাম না; হাত বাড়ালাম কিন্তু শক্ত কিছু হাতের কাছে পেলাম না। চোরাবালি! বিদ্যুতের মত কথাটা মাথায় এল।

"মল্লিকা!" আমি সভয়ে চীৎকার করে ডাকলাম।

মল্লিকার খিলখিল হাসি শুনলাম এবার। সঙ্গে সঙ্গেই সে আমার চার-পাঁচ হাত দূরে এসে দাঁড়াল।

"আমি উঠতে পারছি না মল্লিকা—"

মল্লিকা বলল, "আমি তুলতেও চাই না তোমাকে—"

"মল্লিকা।" তখন কোমর পর্যন্ত ডুবে গেছি।

মল্লিকার চোখ জ্বলছে, সে বলল, "একটু আগে তোমায় বলেছিলাম না যে আমি খুন করব? তাই করলাম। দশ মিনিটেই আমি বাড়ী ফিরে যাব যমুনার সঙ্গে এক মিনিট কথা বলে। কেউ জানতে পারবে না, বুঝতেও পারবে না—"

"মল্লিকা, আমি কি করেছি?"

"কী করেছ তা জানো না? একটি সরলা উচ্চাকাঙ্ক্ষিণী মেয়েকে বড় হবার প্রলোভন দেখিয়ে, আমার গরীব বাপকে টাকা দিয়ে, ঐশ্বর্যের চর্মকে বিভ্রান্ত করে, অবিবাহিত বলে নিজের পরিচয় দিয়ে আমায় ছলনা করে একদিন সর্বনাশ করোনি আমার? তারপর যেদিন জানলাম তুমি বিবাহিত সেদিন আর আমার উপায় ছিল না তাই তোমার পায়ে ধরে বলেছিলাম যে আমায় বিয়ে কর—আমার গর্ভে তোমার সন্তান এসেছে—"

"মল্লিকা, আমি ডুবছি কিন্তু—"

"ডোব, মর তুমি। তারপরেও তুমি নিষ্কৃতি পাবে না জেনো—শয়তান, তোমার পায়ে পড়ে কেঁদেছিলাম আমি, তুমি তার পরিবর্তে আমায় ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে—আমি তাতে রাজী হলাম না, তখন তুমি সু'যোগ বুঝে উধাও হলে—আমি তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তিনি আমায় তাড়িয়ে দিয়েছিলেন—"

"মল্লিকা আমায় বাচাও—"

"তোমার বাঁচবার অধিকার নেই প্রবীর। আমার সর্বনাশ করার সঙ্গেই তোমার মরা উচিত ছিল, এই দু'বছর তুমি বেশী বেঁচেছ—

আমার তখন প্রায় বুক পর্যন্ত ডুবেছে। ঠাণ্ডা, ক্লেদাক্ত সরীসৃপের মত সেই কাদা একটু একটু করে অক্টোপাশের মত আমায় অনিবার্য মৃত্যুর দিকে টানছে। সেই মৃত্যু—যার বিষয়ে এতদিন ধরে মাঝে মাঝে ভেবেছি। অথচ এই মুহূর্তে ভয় লাগছে কেন? মরে দেখিই না মৃত্যুর পরে কি হয়, কেমন লাগে?

"মল্লিকা, আমি মরতে আর ভয় পাচ্ছি না—" হঠাৎ আমি শান্তকণ্ঠে বললাম।

মল্লিকা হাসল, "তাহলে তো খুবই ভাল কথা—আর বোধ হয় পাঁচ মিনিট লাগবে—"

পাঁচ মিনিট! তারপরে এই আলো, এই দৃশ্য সব লোপ পাবে?

আমি বললাম, "কিন্তু মরবার আগে একটা কথা বলে যাই মল্লিকা—"

"বল প্রিয়তম!" মল্লিকার কণ্ঠে ডাইনীর নিষ্ঠুরতা।

"মল্লিকা, আমি কিন্তু প্রবীর মজুমদার নই—"

"তোমার সেই অভিনয়ের সঙ্গে তো আমার পরিচয় হয়ে গেছে—সে অভিনয় শেষও করেছ কাল—"

"মল্লিকা, অভিনয় আসলে কাল থেকেই শুরু করেছি—শুরুতে এবং আজ এই শেষ মুহূর্তে সত্যি কথাই বলেছি এবং বলছি।"

"তুমি মিথ্যেবাদী—তুমি যদি প্রবীর নও তো 'মায়া-কুঞ্জে' আছ কেন?"

আমার নিয়তি সেখানে আমাকে টেনে নিয়ে গেছে মল্লিকা—প্রবীর মজুমদারের মায়ের রূপ ধরে—আমি আসলে শান্তনু রায়, বাবার নাম অনিমেষ রায়, আমি পাটনায় মানুষ হয়েছি, মাত্র বছর দেড়েক হল এখানে এসেছি। আমি গরীব মানুষ, চৌরঙ্গীর 'দি প্রিমিয়ার শর্টহ্যাণ্ড এণ্ড্ টাইপরাইটিং স্কুলে টাইপিং শেখাতাম—হঠাৎ একদিন মিসেস মজুমদার আমায় দেখতে পেলেন। আমি অবিকল প্রবীরের মত দেখতে বলে ছায়ার মত তিনি আমায় অনুসরণ করে করে শেষে কেঁদেকেটে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যান—আমার মুখ দেখে দেখে তিনি পুত্রশোক ভুলতে চান—"

মল্লিকা চেঁচিয়ে উঠল, "মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা, তাহলে প্রবীর গেল কোথায়?"

"প্রবীর খুন হয়েছে, বোম্বাইয়ের কাছাকাছি, একটি নারীঘটিত ব্যাপার বলে মনে হয়—"

"মিথ্যে কথা—" মল্লিকা যেন হঠাৎ উন্মাদিনী হয়ে গেল, আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল।

"আমি সত্যি কথা বলছি মল্লিকা। মিসেস মজুমদার আমাকে সব কথা বলেছেন—"

"মিথ্যে কথা—নইলে আমি জানলাম না কেন?"

"কি করে জানবে, মিসেস মজুমদার যে একথা গোপন রেখেছেন পৃথিবীর কাছ থেকে—তাঁদের পারিবারিক সুনাম বাঁচাবার জন্য—"

"চুপ করো, আর মিছে কথা বোলো না—তুমি যদি প্রবীর না হও তাহলে কাল আমায় চিনলে কেন?"

"চিনিনি মল্লিকা, চিনবার ভাণ করেছিলাম যাতে জানতে পাই প্রবীর তোমার কী সর্বনাশ করেছিল। একটা বোকামি আমায় পেয়ে বসেছে কিছুদিন ধরে—আমি প্রবীর মজুমদারের বাড়ীতে থাকতে তার বিষয়ে সব কিছু জানার লোভে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি—"

"না—না—না—" হঠাৎ মল্লিকা পিছিয়ে গেল, ঘুরে ছুটে চলে গেল।

আমি চীৎকার করে বললাম, "মল্লিকা শুনে যাও—আমি মরে দুঃখিত হব না—প্রবীর মজুমদারের শেষ কি ভাবে হওয়া উচিত ছিল তাই এবার জেনে যাব—সেই সঙ্গে এ কথাও বলে যাব যে আমি তোমায় একদিনেই ভালবেসে ফেলেছি মল্লিকা—"

মল্লিকা তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আমার বুক ডুবে গেছে তখন। আমার মাথার ওপরে চাঁদ, আকাশে ছেঁড়া মেঘের মিছিল। হঠাৎ দূর পাঠনার এক স্নেহাতুর বৃদ্ধের কথা আমার মনে পড়ল। মনে পড়ল অনেক ছোটবড় সুখ দুঃখের কাহিনী। ভাবলাম যে মৃত্যু যত বড় রহস্যই হোক না কেন, তা জানার এখনো সময় হয়নি আমার। হঠাৎ আবার বাঁচতে ইচ্ছে হল, মরতে ভয় হল। আমি দু'হাত তুলে সামনের দিকে লাফাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলাম, হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে শক্ত কিছু আঁকড়ে [illegible] জীবনের খোঁজ করতে লাগলাম। কিন্তু কিছুই পেলাম না।

ক্লেদাক্ত মৃত্যু আমার শ্বাসরোধ করার জন্য কণ্ঠা পর্যন্ত ছুঁয়ে ফেলল। আমি চীৎকার করে শেষবারের মত ডাকলাম মল্লিকাকে।

"মল্লিকা—ম-ল্লি-কা—বাঁচাও। নিরপরাধীকে মেরো না—"

কিন্তু কোনো সাড়া পেলাম না মল্লিকার। শুধু আমার বেসুরো চীৎকারকে যেন চাপা দেবার জন্যই একটা রেল-ইঞ্জিনের হুইস্‌লের তীক্ষ্ণ শব্দ ভেসে এল। আর ভেসে এল একটা ঢোলের শব্দ—ডুম্ ডুম্ ডুম্—ডুম্ ডুম্ ডুম্। আমি কেঁদে ফেললাম। আমি আর তখন এ্যাডভেঞ্চার-পিপাসু যুবক বা পুরুষমানুষ নেই—আমি তখন একটি অসহায় ও আতঙ্কিত একটি জীব যে বাঁচতে চাইছে। আমি কাঁদলাম, গলা ছেড়ে কেঁদে উঠলাম। আর মনে হল আমার সেই কান্নার সঙ্গে একটা উৎকট তাল রাখার জন্যই যেন নেপথ্যে কোনো প্রেত সেই ঢোলটা পিটিয়ে চলেছে—ডুম্ ডুম্ ডুম্—ডুম্ ডুম্ ডুম্।

হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা হাওয়া ভেসে এল। ভেসে এল সেই অজানা ফুলের সুবাস।

আর শোনা গেল মল্লিকার গলা, "কাঁদবেন না—আপনাকে আমি বাঁচাব—"

তাকিয়ে দেখলাম যে আমার কয়েক হাত দূরেই মল্লিকা দাঁড়িয়ে আছে।

"মল্লিকা—ডুবে গেলাম যে—" আমি বললাম।

"না, ডুববেন না—ধরুন এই দড়িটা—" বলেই মল্লিকা একটা দড়ি ছুঁড়ে দিল আমার দিকে। আমি সেটা ধরলাম।

"দাঁড়ান, এটা একটা কিছুতে বাঁধি—" সে আবার চোখের আড়ালে গেল। দড়ির একটা প্রান্ত তার হাতে।

আবার ফিরে এল সে, বলল, "এবার দড়ি ধরে উঠে আসুন—"

আমি তার কথামত উঠবার চেষ্টা করতে লাগলাম। যেন বহু শুঁড়-যুক্ত একটা হাতীর নাগাল থেকে বেরিয়ে আসছি আমি এমনি কষ্ট হতে লাগল।

"উঠে আসুন—হ্যাঁ, এবার আর একটু—আর একটু—" মল্লিকা

বারবার উৎসাহ দিতে লাগল।

অবশেষে উঠে বসলাম। আমি বাঁচলাম। আমি অনুভব করলাম জীবনের কী তীব্র মাধুর্য! আমি আবার কাঁদলাম।

মল্লিকা নরম গলায় বলল, "কাঁদবেন না—"

আমি কান্নার মধ্যেই বললাম, "তুমি—তুমিই আমায় বাঁচালে—"

মল্লিকা বলল, "এবার উঠুন, চান করে কাপড়জামা বদলে নিন—"

"কাপড়জামা!"

"আমার বাবার কাপড়জামা—"

আমি উঠে দাঁড়ালাম।

মল্লিকা বলল, "সাবধানে আসুন—ঠিক আমার পেছন পেছন—"

ঢোলটা তখনো বেজে চলেছে। এখন তা জীবনোল্লাসের হর্ষ-ধ্বনি বলে মনে হতে লাগল। ডুম্ ডুম্—ডুম্ ডুম্—

আমি মল্লিকার পেছু পেছু আবার ফিরে চললাম। মৃত্যুকে ছুঁয়ে জীবনে ফিরে চললাম। মল্লিকার দেহের সেই সুবাসকে বাতাসের সঙ্গে জোরে জোরে নিশ্বাসের সঙ্গে টেনে বুক ভরে তুলে তাদের বাসায় পৌঁছোলাম।

"মা আমি এসেছি—" মল্লিকা বাইরের ঘর থেকে চেঁচিয়ে ডাকল।

"আচ্ছা মা—" মায়ের গলার আওয়াজ পেলাম।

"শান্তনুবাবু বলে আমার একজন বন্ধু কাদায় পড়ে গিয়েছিলেন, তিনি চান করবেন—"

"বেশ তো—বাথরুমে নিয়ে যা—"

মল্লিকা বাইরের দরজা বন্ধ করে বলল, "আসুন—"

আমি চান করে মল্লিকার বাপের একটা খাটো মোটা ধুতি এবং একটা পাঞ্জাবী পরে খানিকবাদে বাইরের ঘরে এলাম। মল্লিকার মা কিংবা বাবা কাউকে কিন্তু দেখতে পেলাম না। শুধু ভেতরের একটি ঘর ও রান্নাঘরে আলো জ্বলছে দেখলাম আর কাশির শব্দ পেলাম দু'বার।

বাইরের ঘরে আসতে না আসতে মল্লিকা চা নিয়ে এল, বলল,

"চায়ের সঙ্গে আর কিছু দেবার মত নেই—খান—"

"এই যথেষ্ট মল্লিকা, এখন চা-টাই দরকার ছিল।"

চা শেষ করে তাকালাম তার দিকে। কেমন যেন দেখাচ্ছে তাকে। বিবর্ণ, নিষ্প্রভ। তবু বড় সুন্দর। মল্লিকা রূপসী। মরতে গিয়ে যে কথা ঘোষণা করেছিলাম তা আবার ঘোষণা করতে ইচ্ছে হল কিন্তু পারলাম না।

বললাম, "মল্লিকা, আমার কথা, বিশ্বাস করেছ?"

মল্লিকা আমার দিকে তাকাল, বলল, "শান্তনুবাবু, এবার আপনি যান। বেঁচে ফিরে গেলেন, এই কথা মনে রাখবেন এবং এদিকে আর কোনদিন আসবেন না—"

"মল্লিকা!"

"যান—আপনি যান দয়া করে—" মল্লিকার গলা কাঁপতে লাগল, সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

"তাহলে আর কি দেখা হবে না? কোনোদিন নয়?"

"না না—কোনোদিন নয়—যান, আপনি এবার দয়া করে যান বলছি—"

আমি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলাম। পেছনে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। আমি দু'সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে আবার এগিয়ে গেলাম।

কিছুদূর এগিয়ে আমি সেই ফুলুরির দোকানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম যে সেই টাকমাথা দোকানদার তখনো ফুলুরি ভেজে চলেছে। অথচ দোকানে একটিও ক্রেতা নেই। পাগল নাকি লোকটা?

আর কিছুদূর এগিয়ে রাস্তা গুলিয়ে ফেললাম। ডাইনে কি বাঁয়ে ঠাহর করতে পারলাম না।

একটা মুদির দোকান। লোকজন আছে সেখানে। কাছাকাছি একটা বাড়ী থেকে রেডিয়োর শব্দ আসছে।

দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "বালীগঞ্জের দিকে যাব—কোনদিক দিয়ে বলুন তো?"

"সোজা গিয়ে বাঁ দিকে—এদিকে নতুন বুঝি? কোথায়

গেছলেন ?”

“ঐ পুকুরের দিকে—”

“পুকুর ধারে !” ভদ্রলোক যেন কেমন হয়ে গেলেন।

আমি পা বাড়াতেই তিনি ডাক দিলেন। ঘুরে তাকালাম।

“ওদিকে আর কোনোদিন যাবেন না—”

“কেন বলুন তো ?”

“জায়গাটা ভালো নয়—”

“তা জানি—”

গায়ে পড়ে ভদ্রলোকের এই উপদেশ দেওয়া ভালো লাগলো না। আমি রাস্তা ধরলাম। আমার মাথায় তখন একটি কথাই ঘুরছে। আমি ভালবাসায় পড়েছি, আমি মল্লিকাকে ভালবেসে ফেলেছি। প্রবীর মজুমদার সাজায় আমার শুধু এইটুকু লাভ হল। লাভ হতেই অবশ্য ক্ষতিও হল। আর দেখা হবে না মল্লিকার সঙ্গে। মল্লিকা শুধু প্রবীর মজুমদারকেই ভালবাসে। সেই মৃত প্রবীরের ওপর আমার ঈর্ষা হল। সবাইকে সে বঞ্চনা করে, তবু সবাই তাকে ভালবাসে কি করে ? ভালবাসা কি দেওয়া-নেওয়া না শুধুই দেওয়া ? কিন্তু মল্লিকাকে আমি ভালবাসলাম কি করে ? তার যে সন্তান আছে—প্রবীরের অযাচিত উপহার ! কি জানি কেন, এটাকে আমার সমস্যা বলে মনে হল না। মনে হল সব সংস্কারেরই অবস্থাভেদে পরিবর্তন হয়, তাছাড়া এ যুগে তো এখন এসব ঘটনা প্রচুর ঘটছে। সমাজ এখন উদার কিংবা নির্বিকার। বাবা ? কি হবে ভেবে তাঁর কথা ? মল্লিকার সঙ্গে তো আর দেখা হবে না। মল্লিকার গল্প জানা হয়ে গেছে।

॥ সাত ॥

সে রাতে অনেকক্ষণ ভেবেছিলাম। আর কি দরকার 'মায়া-কুঞ্জে' থাকার? প্রবীর মজুমদারের গল্পের আর কি জানা বাকি রইল? মিসেস মজুমদারকে কি এসব কথা বলব? মল্লিকার কথা জিজ্ঞেস করব? পরে ভেবে দেখলাম তার কোনো দরকার নেই। হয়ত মল্লিকাকে তিনি তাড়িয়েই দিয়েছিলেন, তাঁর দোষ নেই। প্রবীর মজুমদার কত মেয়ের হয়ত এমনি সর্বনাশ করেছে, তাদের সবাইকে কি তিনি পুত্রবধূ বলে স্বীকৃতি দিতে পারেন? অনেক ভেবে স্থির করলাম যে থাকব আরো কিছুদিন। আগে চাকরিটা পাই তারপর কিছুদিন বাদে এখান থেকে চলে যাব। মিসেস মজুমদারকে এখুনি দুঃখ দিতে ইচ্ছে হল না।

পরদিন রাতে রমা আবার সেই একই ভঙ্গীতে লাইব্রেরীতে এসে 'আশ্চর্য' বলল। আমি তখন একা। সেই বিশেষভাবে সেজেগুজে সেদিনকার মত হঠাৎ এসে জিজ্ঞেস করল আমার বাঁ গোড়ালিতে কাটা দাগ আছে কিনা। ছিল একটা দাগ। তা দেখে সে বলল, 'আশ্চর্য!' তারপরেই সে চলে গেল। তাকে কারণ জিজ্ঞেস করাতে অন্যান্যবারের মত এবারও কিছু বলল না। তবে আমি ঠিকই অনুমান করলাম। প্রবীর মজুমদারের সঙ্গে সব কিছুতেই মিলে যাচ্ছি আমি, তিলে, কাটা দাগে, খাওয়ার ভঙ্গীতে, সব কিছুতে। এতে রমা আশ্চর্য হতে পারে বইকি। আমারো আশ্চর্য লাগতে লাগল। বিধাতাপুরুষের এমন করার উদ্দেশ্য কি?

রমার মধ্যে কি পরিবর্তন এসেছে? মিসেস মজুমদারের কথায় তো সেদিন তাই মনে হল। সেদিনও রমার বাজনা আর গান শোনা গেল। প্রেমের গান। গান শেষ হবার পরও পিয়ানোর বাজনা চলল, বাজনা ক্রমেই উদ্দাম হয়ে উঠল। রমা ভালো পিয়ানো বাজায়। প্রবীর মজুমদার নাকি কোন এক সায়েবকে রেখেছিল রমাকে পিয়ানো শেখানোর জন্য। কিন্তু আজ এতদিন পরে তার হঠাৎ গানবাজনার

শখ ফিরে এল কেন? বুঝতে পারলাম না। শুধু আবার মনে হল যে রমার মাথা খারাপই।

দু'দিন বাদে চাকরিতে যোগ দিলাম।

মিসেস মজুমদার সেদিন খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমায় তিনি দামী একটা স্যুট এনে পরতে দিলেন।

"এসব কেন

"যেমন চাকরি তার তেমনি পোশাক বাবা—তুমি না করো না তো, আমার কথা তোমাকে মানতেই হবে।"

পরলাম সেই পোশাক। আমার মাপজোপ কোথায় পেলেন মিসেস্ মজুমদার?

"বাঃ এতো চমৎকার ফিট করেছে মা—কখন মাপ নিলেন আর কখনই বা তৈরী করালেন?"

মিসেস মজুমদার ম্লান হেসে বললেন, "এগুলো প্রবীরের বাবা—দামী দামী কত পোশাক যে পড়ে আছে—তুমি এগুলোর সদ্ব্যবহার কর—"

মনটা একটু খুঁৎ খুঁৎ করল কিন্তু পরে মেনে নিলাম। সত্যি তো, কি যায় আসে, পোশাকগুলো নষ্ট করে লাভ কি?

কাজে যোগ দিলাম। কাজ খুব কঠিন নয়, চিঠিপত্র লেখার কাজ, তাছাড়া মাঝে মাঝে বড় বড় কয়েকটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কর্তাদের সঙ্গে গিয়ে কথা বলা। মনে হল সুপারিশের জোরে প্রমোশনও তাড়াতাড়ি হবে।

প্রথম দিন চাকরি থেকে ফিবতে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। হাত মুখ ধুয়ে চা খেতে বসেছি এমন সময়ে এল জয়ন্ত বসু।

আজো সে ভেতরে গেল। নিশ্চয় রমার সঙ্গে কথা বলতে। অর্থাৎ প্রেম নিবেদন করতে। লোকটা আচ্ছা নির্লজ্জ তো! বন্ধুর স্মৃতিকে এতটুকুও মর্যাদা দেয় না!

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে জয়ন্ত বসু বেরিয়ে এল। তার মুখে চোখে কেমন একটা চাপা উত্তেজনা থমথম করছে মনে হল। সোজা

গাড়ীবারান্দায় এসে সে দাঁড়াল ও একটা সিগারেট ধরাল। তারপর বাগানের ভেতর দিয়ে এগোতে গিয়েই আমায় দেখে থমকে দাঁড়াল। আমি তখন বাগানে বসে আছি। একটা গাছতলায়, কাছাকাছি পাথরের তৈরী একটি পরীর হাতের মশালের মধ্যে একটি আলো জ্বলছিল।

আমি বললাম, "নমস্কার—"

জয়ন্ত বসু হেসে বলল, "আপনাকে যতখানি বুদ্ধিমান ভেবেছিলাম আপনি কিন্তু ততখানি নন—"

আমি সোজা উঠে দাঁড়ালাম, বললাম, "আমার সত্যি বুদ্ধি কম—একটু খুলে বলুন—"

"বলব ?" হাসিমুখেই বলল জয়ন্ত বসু।

"বলুন।"

"আপনাকে শেষবার 'ওয়ার্ন' করে যাচ্ছি—শান্তনু রায়ের এ বাড়ী থেকে অবিলম্বে চলে যাওয়া উচিত, নইলে বিপদ হতে পারে—"

"আপনার কথাটা এবার ধরতে পারছি। তার মানে আপনি আমায় শাসাচ্ছেন !"

হ্যাঁ শাসাচ্ছি—সতর্ক করছি শেষবারের মত—শান্তনুবাবু, সময় থাকতে প্রাণ বাঁচান—" আগের মতই হাসিমুখে, স্পষ্ট অথচ মৃদুগলায় জয়ন্ত বসু বলল।

"জয়ন্ত !" হঠাৎ মিসেস মজুমদারের গলা শুনে আমরা ফিরে তাকালাম।

জয়ন্ত হাসিমুখে বলল, "মাসীমা ! আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল—"

মিসেস মজুমদার বললেন, "হ্যাঁ, ভালই হল, তোমাকেও আমি প্রথম এবং শেষবার আজ বলছি—যে কথা অনেকদিন ধরে বুঝতে পেরেও নেহাৎ ভদ্রতা এবং মরা ছেলের কথা ভেবে তোমায় বলিনি—"

"আপনি কি বলতে চাইছেন ?"

"তোমার কি অভিসন্ধি তা আমি জানি। রমার মনোভাবও তুমি

আজ স্পষ্ট করেই জেনেছ, আমার মনোভাবও তার থেকে পৃথক নয়। তবু ভেবেছিলাম থাক্, এখুনি কোনো আলোচনা করব না। কিন্তু তুমি শান্তনুকে যা বলেছ তার পরে তোমায় বলতে বাধ্য হচ্ছি—তুমি ভদ্রলোকের ছেলে হলে এ বাড়ীতে আর আসবে না এবং আমাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখবে না—"

"এতে কি আপনাদের ভালো হবে? আমি আপনাদের—"

"আমাদের ভালোমন্দের কথা তোমার ভাবার দরকার নেই জয়ন্ত—আর আমাদের সন্দেহ নেই তুমি কিসের লোভে আমাদের ভালো করার কথা ভাবতে।"

"কিন্তু—"

"তোমার লক্ষ্য ছিল রমা। সে যদি আজ মজুমদার-বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেত তাহলে আমার আপত্তি ছিল না। সে তা চায় না, তোমাকেও চায় না। আর আমি জানি তুমিও তা চাও না—মজুমদার-বংশের অগাধ ঐশ্বর্যকেও তুমি রমার সঙ্গে হাত করতে চাইছিলে—"

"এসব মিথ্যে কথা।"

"কিন্তু দিনের পর দিন তুমি যে বন্ধুত্বের অপমান করেছ সে কথাও মিথ্যে?"

জয়ন্ত বসু সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল, তারপর বলল, "তাহলে আমায় যেতেই বলছেন মাসীমা?"

"হ্যাঁ বাবা যেতে বলছি এবং আর কোনোদিন আসতেও নিষেধ করছি।"

জয়ন্ত বসু সবেগে ঘুরে ঘুরে তার গাড়ীর দিকে চলে গেল। তার ফিয়াট সবেগে ও সগর্জনে 'মায়া-কুঞ্জ' থেকে চিরকালের জন্য বেরিয়ে গেল।

মিসেস মজুমদার আমার দিকে তাকালেন, "বুঝতে পেরেছ বাবা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—এইসব অপ্রীতিকর ব্যাপার নিয়ে আমি আর আলোচনা করতে চাই না।"

"সেই ভালো বাবা, সেই ভালো।"

গল্প ক্রমেই জটিলতার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। আমার মনে নানা চিন্তার আবির্ভাব ঠিকই ঘটল কিন্তু জানিসই তো ভরত, মানুষ-মাত্রেই নিজেকে 'হিরো' ভাবতে ভালবাসে, উপন্যাসের নায়ক হবার সাধ সবার মনেই প্রচ্ছন্ন থাকে। বিশেষ করে যে বয়সে থাকে তখন আমার সেই বয়স। সুতরাং মনে নানা চিন্তা এল এবং বর্ষাশেষের মেঘের মত তা উড়েও গেল। তখন কি আর জানতাম যে ফিয়াটে চড়ে 'মায়া-কুঞ্জ' থেকে জয়ন্ত বসুর প্রস্থান মানে আমার জীবনে নানা বিপদের সমাবেশ!

ঠিক দু'দিন পরের কথা।

আমি রাত বারোটার পর লাইব্রেরী থেকে শোবার ঘরে গিয়ে এক গেলাস জল খেয়ে সবে বিছানার দিকে এগোচ্ছি এমন সময় জানালা দিয়ে হঠাৎ একটা রিভলবারের গুলি এল। আমি চমকে সরে গেলাম দু'পা, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা গুলি। আমি বসে পড়লাম। হলঘরে মিকি গর্জন করে উঠল। বাইরে ঘনশ্যাম, বলবীরের চীৎকার শোনা গেল। বাগানে কে যেন দৌড়ে যাচ্ছে মনে হল। আমি হাত বাড়িয়ে টেবিললাম্পটা নিভিয়ে দিলাম, তারপর দরজার দিকে এগোলাম। বাইরে 'পাক্ড়ো পাক্ড়ো' শব্দ শোনা গেল। হাৎড়ে হাৎড়ে বাইরের বারান্দায় গিয়ে পৌঁছোলাম আমি। ততক্ষণে বাকী সবাই উঠে পড়েছে। ওপর থেকে মিসেস মজুমদার নেমে এলেন, সঙ্গে সঙ্গে রমা। গুর্খা দারোয়ান ও বলবীর ফিরে এল। ঘনশ্যাম জানাল যে একটি কালো ট্রাউজার ও রঙীন শার্ট-পরিহিত লোককে তারা বাগানের ভেতর দিয়ে ছুটে বাঁদিকের দেয়াল টপ্‌কে পালাতে দেখেছে। দারোয়ান এবং বলবীর ছুটে বাইরে গিয়েছিল, এদিক ওদিক খুঁজবার জন্য এগোতেই একটা জীপ গাড়ীকে গলি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে কিন্তু তার নম্বর তারা দেখতে পায়নি, কারণ গাড়ীর আলো জ্বালেনি আততায়ী। কে সে? কেন আমায় খুন করার চেষ্টা করল? আমি কার কি ক্ষতি করেছি?

মিসেস মজুমদার আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু অথচ উত্তেজিত কণ্ঠে

বললেন, "আমি জানি কে ?"

"কে ?"

"জয়ন্ত।"

"কিন্তু—"

"কিন্তু একথা পুলিশকে বলার নয়, তবু ফোন করতে হবে।"

তারপর থানায় খবর দেওয়া হল। দারোগা পুলিশ এল, সব খবর লিপিবদ্ধ করে, নানা প্রশ্ন করে সেই রাতের ঘুমকে তাড়িয়ে তবে তারা গেল। কারো ওপরে সন্দেহ হয়কি ? পুলিশের এই প্রশ্নের উত্তরে কিন্তু কিছুই বলা গেল না।

সেই রাতেই (তখন অবশ্য ভোর হতে আর ঘণ্টাখানেক বাকী ছিল) মিসেস মজুমদার আমাকে নীচের ঘর ছেড়ে ও'রে প্রবীর মজুমদারের শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন।

"আজ থেকে এই ঘরে শোবে তুমি বাবা—না না, কোনো কথা শুনবো না—ওঘরে আর তোমার শোওয়া হবে না—" মিসেস মজুমদার কড়া গলায় বললেন।

তাঁর হুকুম তামিল করতে আমার এতটুকুও দ্বিধা হল না। এই আকস্মিক হত্যা প্রচেষ্টা নাটকীয় মনে হলেও একটু ভয় যেন আমার মনের মধ্যে ছটফট করে বেড়াতে লাগল, কাঁপতে লাগল। কে ? কে আমাকে খুন করতে চায় ? জয়ন্ত বসু ? কিন্তু আমাকে খুন করে তার কী লাভ ?

কিন্তু ভোর হতেই কেমন যেন পৌরুষে ঘা লাগল। আমি ভয় পেয়েছি ! ছিঃ। মিসেস মজুমদার আমাকে বারবার বলতে লাগলেন ছুটি নিয়ে বসে থাকতে, পুলিশ 'এন্‌কোয়ারী' শেষ হলে তারপর চলা-ফেরা করতে, কিন্তু আমার মন সায় দিল না।

মন বলল, কেটে পড়, যথেষ্ট হয়েছে।

আর এক মন বলল, অসম্ভব, গল্প এবার জটিল হয়ে পরিণতির দিকে ছুটেছে, এখন আর থামা যায় না, পালানো যায় না।

আর এক মনই তর্কে জিতল এবং আমি ঘড়ির কাঁটা ধরে অফিসে গেলাম। অফিসে কাজের ফাঁকে ফাঁকে মল্লিকার কথা মনে পড়তে লাগল। আজ কি যাব তার বাড়ী ? দেখিই না কি হয় ? হঠাৎ আমি প্রবীর মজুমদার নই বুঝতে পারায়, প্রবীর মজুমদার খুন হয়েছে জানতে পেরে তার হয়ত সাময়িক ভাবে মাথার গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু না, না যাওয়াই ভালো। আমাকে দেখলেই হয়ত আবার তার প্রবীর মজুমদারের কথা মনে পড়ে যাবে। প্রবীর মজুমদারকে সে তো আসলে এখন আর ভালবাসে না। ভালবাসা এখন ঘৃণায় রূপান্তরিত হয়েছে। অমৃত গরল ভেল। ভাবতে লাগলাম প্রবীর মজুমদারের সঙ্গে আমার চেহারার মিল থাকাতে আমার লাভ কি হয়েছে ? একটি উদ্ভট গল্প ? না, মল্লিকাকে আবিষ্কার করেছি আমি। কী আশ্চর্য সুন্দর তার দু'টি চোখ ? আচ্ছা, মরে গেলে কি হয় ? তাহলে হয়ত—। কিন্তু আমি কেন ভাবছি মৃত্যুর কথা ? প্রবীর মজুমদারের কাহিনীতে জড়িয়ে পড়ার পর থেকেই আমার এই এক অদ্ভুত বাতিক হয়েছে— আমি মৃত্যুর কথা ভাবি। ছিঃ—কী হল আমার !

মিসেস মজুমদার আমার হেঁটে যাওয়া বন্ধ করেছিলেন তাই অফিসে তাঁদের গাড়ীতেই গিয়েছিলাম। ফিরলামও তাতেই। তারপর সেই এক রুটিন। চা, জলখাবার, মিসেস মজুমদারের সঙ্গে কথা বলা, রমার গান গাওয়া, খাবার টেবিলে আমার দিকে আশ্চর্য হয়ে তার তাকিয়ে থাকা এবং আমার রক্তস্রোতে এক অবাঞ্ছিত আবেগের সৃষ্টি হওয়া। তারপরে ওপরের ঘরে বই পড়া।

মিসেস মজুমদার পুলিশে দরখাস্ত করে দু'টি কনস্টেবলের বন্দোবস্ত করেছেন চব্বিশ ঘণ্টার জন্য। তারা বাড়ীর চারদিকে টহল দেবে। তাছাড়া দারোয়ান আছে, ঝি-চাকরদেরও বাড়ীর চারদিকে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে যাতে আমার মূল্যবান জীবনের ওপর আবার কোন হামলা না হয়। নিজেকে বেশ বিশিষ্ট বলে মনে হতে লাগল। কিন্তু আমি, এক গরীব বাপের ছেলে শান্তনু রায়। কেন এত মূল্যবান হয়ে উঠলাম এঁদের কাছে, জয়ন্ত বসুর কাছে ? আমার অদৃশ্য আততায়ী

কী সত্যি জয়ন্ত না আর কেউ ? আবার কোনো নতুন সূত্রের উদঘাটন হবে কি ? কে জানে ?

অনেক রাতে, প্রবীর মজুমদারের শয়নকক্ষে বই পড়তে পড়তে হঠাৎ আমি শব্দ পেলাম। কে যেন বারান্দায় হেঁটে গেল। আমি কান পাতলাম। লঘু পদক্ষেপ। যেন কোনো দীর্ঘশ্বাসের মত। আমার কৌতূহল হল। আমি ঘরের আলো নিভিয়ে পা টিপে টিপে দরজা খুললাম, বাইরের বারান্দার দিকে তাকালাম। কই, কেউ নেই তো ! কিন্তু পাশের ঘরে আলো জ্বলছে মনে হল। তাহলে কি রমা জেগে আছে ? হঠাৎ আলো নিভে গেল সেই ঘরে। আমি প্রবীর মজুমদারের কামরায় ফিরে গেলাম। লক্ষ্য করলাম যে দুটি কামরার মাঝখানে একটি দরজা আছে। এদিক থেকে তালাবন্ধ। কার পায়ের শব্দ পেলাম ? না কি আমার অবচেতন মনের আশঙ্কা ? কে জানে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমার হঠাৎ মল্লিকার কথা মনে পড়ল। আমি কি সত্যি ভালবেসে ফেলেছি তাকে ? প্রবীর মজুমদার ভালবাসার ভাণ করে যার ক্ষতি করেছে—তাকে ? করুণা নয় তো ? কী তা আমি জানি না কিন্তু আমি ভালবেসে ফেলেছি মল্লিকাকে। কিন্তু সে তো আমায় সহ্য করতে পারবে না। আমি যে প্রতিনিয়ত তাকে প্রবীর মজুমদারের বিষাক্ত ও অপমানজনক স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেব ! কিন্তু তবু যে ভাল না বেসে পারছি না। মল্লিকা—তুমি কি আমায় গ্রহণ করতে পারবে না ?

হঠাৎ হালকা বাতাস এল ঘরে। জানালার পর্দা উড়ল, ঘরের ভেতর সেই বাতাস চক্কর মেরে, আমায় ছুঁয়ে রোমাঞ্চিত করে, সেই নাম-না-জানা ফুলের সুবাস ছড়িয়ে চলে গেল। কিন্তু মল্লিকার দেহ-সৌরভ এল কোথা থেকে ? একি আমার মনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ! আমার ভালবাসার মৃগনাভি ? ভালবাসা কি ? বিদ্যুৎ-চমকে কিছু আবিষ্কার করা ? অকস্মাৎ বজ্রদগ্ধ হওয়া ? আচ্ছা মরে গেলে কেমন হয় ? মৃত্যুর পরে কি সব শান্ত হয়ে যায় ? এই ঘৃণা, হিংসা, লোভ, লালসা—

তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

॥ আট ॥

পরদিন আবার একটি চমকপ্রদ ঘটনা ঘটল। গল্পের গতিবেগ আরো তীব্র হয়ে উঠল। বড় বড় শহরে ছোট ছোট অনেক কাগজ থাকে তা তো জানিস ভরত—যেসব কাগজ সমাজের গোপন তথ্য আবিষ্কার করে মানুষকে শুধু রোমাঞ্চ পরিবেশন করে জীবিকা অর্জন করে? তেমনি একটি কাগজ, নাম "তুলাদণ্ড", পরদিন শহরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। প্রবীর মজুমদার [illegible] আসলে যে সে খুন হয়েছিল এবং অতি নোংরা ব্য[illegible] এই সব সত্য কথাই তাতে প্রকাশিত হল। নামহীন সংবাদদাতা এই সংবাদ বিস্তৃত ভাবে প্রকাশ না করার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে এবং ইংগিত দিয়েছে যে এই ব্যাপারে নিশ্চয় কোনো গূঢ় রহস্য আছে তা নইলে প্রবীর মজুমদারের মা কেন নিজের একমাত্র সন্তানের বিয়োগান্ত পরিণতির কথা চেপে রেখেছেন? কেন প্রবীর মজুমদারের স্ত্রী বিধবার সাজ গ্রহণ করেন নি? সর্বশেষে সংবাদদাতা লিখেছে যে 'মায়া-কুঞ্জে' নাকি অবিকল প্রবীর মজুমদারের মত দেখতে একটি লোকের আবির্ভাব ঘটেছে। কে সে? কোনো প্রতারক নয় তো?

তারপর সে কি কাণ্ড ভরত! টেলিফোন বিরামহীনভাবে বেজে চলল, মিসেস মজুমদার সত্য-মিথ্যা নানা কৈফিয়ৎ দিয়ে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু আমার বিষয়ে তিনি মিথ্যে কথা বলতে পারলেন না।

ফলে বাড়ীতে লোকজন আসতে শুরু হল। প্রেস থেকে এল প্রথমে। তারপর পরিচিত, অল্প-পরিচিত, নিকট ও দূর আত্মীয়েরা। এল ঈর্ষাতুরেরা এবং মজুমদার-বংশের শত্রুরা। আমায় তারা দেখতে পেল, অবাক হল, গল্পের খোরাক পেয়ে আমায় প্রশ্ন করে, চিমটি কেটে, হাঁটিয়ে, বসিয়ে, নানা দিক থেকে আমার ছবি তুলে পাগল করে তুলল।

"কি করেন মশাই?"

"আগে কোথায় থাকতেন? পাটনা? সেকি, পাটনায় তো আমার ভায়রাভাই থাকে—আপনাকে তো দেখিনি"—

"ওঃ—আপনি প্রবীর মজুমদারের কেউ নন!"

"কদ্দিন আগে কলকাতায় এসেছেন? ছ' বছর!"

"তার মানে প্রবীর মজুমদার মারা যেতেই আপনি এসে হাজির হলেন!"

"স্ট্রেঞ্জ সিমিলারিটি!"

"মনে হচ্ছে প্রবীরের প্রতিবিম্ব!"

শুধু বাড়ীতেই যদি এই কৌতূহল সীমাবদ্ধ থাকত তাহলেও না হয় বুঝতাম ভরত। এরপর দু'তিনদিন রাস্তাতেও গোলমাল হতে লাগল।

"ও দাদা—কিছু মনে করবেন না—আপনিই প্রবীর মজুমদার বুঝি?"

"না না—ইনি নিশ্চই শান্তনু রায়—সেই যে দেখতে একরকম?"

"ঠিক ঠিক—এক্স্‌কিউজ মী, এঁ্যা? সত্যি তো, প্রবীর মজুমদার তো মরে গেছে—"

"ও দাদা—মাপ করবেন, আপনি কে বলুন তো—চেনা চেনা লাগছে যেন!"

অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম ভাই ভরত। পরদিন 'মায়া-কুঞ্জে' আবার এক নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা ঘটল। মজুমদারদের জনকয়েক আত্মীয়া এসে ঝগড়া শুরু করলেন। এতদিন তাঁরা দূরে দূরে ছিলেন, হঠাৎ প্রবীর মজুমদার বেঁচে নেই জানতে পেরেই তাঁরা হিন্দুধর্মের আদবকায়দা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মিসেস মজুমদারের সঙ্গে তাঁদের ঝগড়া শুরু হল। রমা কেন সধবা সেজে আছে? কেন সে বিধবা সাজবে না? কথাটা ঠিকই তো। মনে মনে আমিও সায় দিলাম। কিন্তু মিসেস মজুমদার অটল রইলেন। রমার ইচ্ছে হলেই সে তার বেশভূষার পরিবর্তন করবে। অর্থাৎ রমা এখনো সধবা সেজেই থাকবে এবং লোকাচারের ধার ধারেন না তিনি। বলাবাহুল্য, এরপর থেকে আত্মীয়স্বজনদের এই আকস্মিক আসা যাওয়া আবার

অকস্মাৎই বন্ধ হয়ে গেল। মিসেস মজুমদারও গুর্খা দারোয়ানকে ফটকে তালা ঝুলিয়ে দিতে বললেন এবং 'মায়া-কুঞ্জ' একটি অবরুদ্ধ দুর্গের মত হয়ে উঠল! মিসেস মজুমদার আমায় সেই দুর্গের ভেতর সুরক্ষিত রাখার সমস্ত ব্যবস্থাই করলেন এবং আমি গল্পের 'ক্লাই-ম্যাক্সে'র প্রতীক্ষায় দিন কাটাতে লাগলাম আর বাতাসে সেই অজানা ফুলের সুবাসের [illegible]ম। মল্লিকার জন্য আমি ভেতরে ভেতরে [illegible]লাম, তাকে দেখার জন্য অধীর হয়ে উঠ[illegible]ম।

চারদিন পরে। সেদিন অফিসে কোন কাজেই মন লাগছিল না। ঘড়ির কাঁটা কর্মশেষের মুহূর্ত ঘোষণা করতেই আমি বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে মজুমদারদের ইম্পালা প্রতীক্ষা করছিল। আমি ভাবলাম যে সোজা বালীগঞ্জ স্টেশনে যাব। আজ মল্লিকার সঙ্গে দেখা করবই, তাতে সে রাগ করুক আর যাই করুক।

অফিসের বাইরে বেরোতেই দেখি চমৎকার হাওয়া বইছে হঠাৎ হাওয়াতে সেই পরিচিত সুবাস পেলাম। আমি চারিদিকে তাকালাম। মল্লিকাকে যদি হঠাৎ দেখতে পেতাম এখুনি! আমার অন্তরের এই মৃগনাভির সুগন্ধ তাহলে সত্যি হয়ে উঠত।

আশ্চর্য, যা চাইলাম তাই পেলাম। মল্লিকাকে দেখতে পেলাম। ঘুরতেই দেখি ফুটপাতের প্রান্তে, একটি অট্টালিকার দেওয়ালের পাশে সে দাঁড়িয়ে আছে। সাধারণ একটা বাসন্তীরংয়ের তাঁতের শাড়ী পরনে, কাঁধে একটা কাপড়ের নক্সা-তোলা ঝোলা। সে আমার দিকে তার দুটি আকাশের তারার মত চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। তাতে কি হাসি রয়েছে? সে হাসি আনন্দের না বেদনার? কিছুই বুঝলাম না। মুহূর্তের জন্য আমার চারিদিকে চলমান জনস্রোত যেন একটা ছায়া-মিছিল হয়ে গেল, সমস্ত শব্দ যেন বহু-দূরবর্তী কোনো মধুচক্রের গুঞ্জনধ্বনি বলে মনে হতে লাগল এবং আমি ভাবলাম যে মল্লিকার জন্য আমি মরে যেতেও রাজী আছি! মল্লিকার জন্য বাঁচাও যায় আবার

মরাও যায়।

কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। তারপরই আমি বললাম, "মল্লিকা!"

মল্লিকা নড়ল না, মৃদু হেসে বলল, "বাড়ী ফিরছেন?"

"বাড়ী! হ্যাঁ—না—এই মুহূর্তে কী ভাবছিলাম জানো?"

"না—আপনার মনের কথা আমি কি করে জানব?"

"তোমার—তোমার কথা ভাবছিলাম মল্লিকা—ভাবছিলাম যে নির্লজ্জ হয়ে, নিষেধ অগ্রাহ্য করেও তোমার বাড়ীতে যাব"—হঠাৎ থেমে গেলাম। মল্লিকার চোখে কেমন যেন একটা গাঢ়তা, কিসের যেন একটা ছায়া। সে কি আসন্ন সন্ধ্যার ক্রমবর্ধমান—

"এখানে দাঁড়িয়েই কথা বলবেন বুঝি?" মল্লিকা মৃদু হেসে বলল।

আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম, "না না, তা কেন, চল গাড়ীতে চড়ে যাই।"

"না।"

"কেন?"

"প্রবীর মজুমদারের গাড়ীতে নয়—"

"বুঝেছি। বেশ, গাড়ী ফেরৎ পাঠিয়ে দিচ্ছি, তারপর চল আমরা ট্যাক্সি করে যাব—"

"বেশ।"

আমি ইম্পালা গাড়ীর দিকে এগিয়ে গেলাম। যেতে যেতেও ফিরে ফিরে তাকাতে লাগলাম মল্লিকার দিকে। সে একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে, আমাকে লক্ষ্য করছে।

পরেশ ঝিমোচ্ছিল তাকে ডেকে বিদায় করলাম, মিসেস মজুমদারকে বলতে বললাম যে আমার জন্যে যেন তিনি কোনো চিন্তা না করেন, আমি খানিক বাদে ফিরব। পরেশ একটু অপ্রসন্নচিত্তেই বিদায় নিল এবং মনে হল যে গাড়ী ছাড়ার আগে আমার মল্লিকার দিকে চকিত দৃষ্টি মেলে তাকানো লক্ষ্য করল, মল্লিকাকেও দেখতে পেল। তারপরে ধাবমান রাজহংসের মত ইম্পালা অদৃশ্য হল।

আমি মল্লিকার কাছে ফিরে গেলাম।

মল্লিকা প্রশ্ন করল, "অমন ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলেন কেন?" তার গলায় নিস্পৃহ কৌতূহল।

আমি বললাম, "যদি তুমি হারিয়ে যাও এই ভয়ে।"

মল্লিকার দু' চোখের তারায় যেন হঠাৎ নক্ষত্রদের স্পন্দমান আলো কেঁপে উঠল, তারপরে সে বলল, "চলুন।"

আমি ট্যাক্সি ধরলাম অতি কষ্টে। আমি ভেতরে বসে ড্রাইভারকে একটা হোটেলের নাম করলাম।

মল্লিকা বলল, "না না—"

"কেন, আমার যে ক্ষিদে পেয়েছে।"

"আচ্ছা চলুন তাহলে।"

একটা হোটেলে গেলাম। একটু আড়ালে বসলাম আমরা। মল্লিকা চা ছাড়া কিছুই খেল না। আমি দু'একটা কথা বলতে চাইলাম। মল্লিকা কেমন যেন গুটিয়ে রইল। যদিও হোটেলের উজ্জ্বল আলোতে আমি লক্ষ্য করলাম যে মল্লিকাকে আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে। উজ্জ্বল একটা চন্দ্রকান্ত মনির মত চমকাচ্ছে, একটা আশ্চর্য স্নিগ্ধতা বিকীরণ করছে সে।

"মল্লিকা—জানো কত কাণ্ড হয়েছে?"

"কাগজে কি সব বেরিয়েছে তো?—জানি।"

"আমাকে খুন করার চেষ্টাও চলছে—"

"এ্যাঁ!" মল্লিকা যেন চমকে উঠল, "সেকি, কবে? কি হয়েছিল?"

আমি সংক্ষেপে তাকে সব বললাম। শুনতে শুনতে মনে হল সে যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল, দুলে উঠল, তারপর সে বলল, "ভগবান আছেন। আমি—আমি জানি কে এসব করছে?"

"কে?"

"বলব—পরে বলব—"

আমি হেসে বললাম, "হয়ত যে কোনো সময়ে আমি মরতে পারি মল্লিকা। হয়ত এই মুহূর্তে—"

মল্লিকা যেন আর্তনাদ করে উঠল, "না—না—আমি থাকতে কেউ আপনাকে ছুঁতে পারবে না—" বলতে বলতে সে আমার হাতের ওপর তার একটা হাত রাখল। আর্দ্র ও ঠাণ্ডা হাত কিন্তু নরম, আশ্চর্য নরম হাত। যেন সিল্কের স্পর্শ। এত নরম যে সেই কোমলতা যেন একটা আগুনের শিখা হয়ে আমার দেহেমনে প্রবেশ করে সেখানে উত্তাপের দাবানল সৃষ্টি করতে লাগল।

আমি ব্যগ্রভাবে সেই হাত চেপে ধরে বললাম, "আমারো তাই মনে হয় মল্লি—আমি মরব না—মরলেও ভয় পাব না, দুঃখিত হব না, কারণ তুমি আছ কাছে—"

মল্লিকা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলল, "না না—"

"কি বলছ!"

"কিছু না—এবার চলুন, এখানে ভালো লাগছে না—"

"আচ্ছা চল—বেয়ারা—"

বেয়ারা বিল আনতে গেল। আমি মল্লিকার দিকে তাকিয়ে বললাম, "হঠাৎ আজ আমার কথা মনে পড়ল কি করে মল্লিকা?"

"আপনি বলুন।"

"আমি ভাবছিলাম বলে।"

"হয়ত তাই।"

"শুধু তাই? আর কিছু নয়?"

"আপনাকে আমার কিছু বলার আছে।"

"কি?"

"ক্ষমা চাওয়ার আছে—আপনাকে প্রবীর মজুমদার ভেবে আমি সেদিন—"

"মল্লিকা—চুপ কর, আবার তোমার এই আবির্ভাব যেন আমার

কিন্তু কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলাম। মল্লিকার কানে সেই মুক্তো দুটো আজ নেই, শুধু দুটো পাতলা রিং; গলায় সেই মটরদানা হার নেই, শুধু একটা সরু চেন; হাতে সেই ঝকঝকে চুড়িগুলো নেই,

শুধু ক'গাছা লাল চুড়ী, শাড়ীর পাড়ের সঙ্গে বর্ণচ্ছন্দে মেলানো। সেইসব অলংকার না থাকাতেও এতক্ষণ মল্লিকার রূপের ব্যতিক্রম ঘটেনি, তার রূপ এমনিই স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু নেই কেন ?

"মল্লিকা—"

"উঁ ?"

"তোমার কানের মুক্তো—গলার হার—"

মল্লিকার চোখ জ্বলে উঠল, সে মাঝপথেই বলল, "আর পারব না।"

"কেন বেশ তো দেখাত—"

"না, আর পরব না—"

"কেন ?"

"ওগুলো প্রবীর মজুমদারের উপহার—তাই ফেলে দিয়েছি—"

"ওঃ—"

বেয়ারা বিল নিয়ে এল। আমরা নিঃশব্দে বেরোলাম। মল্লিকা কি যেন ভাবছে চলতে চলতে। আমি মল্লিকার কথাগুলোকে নিয়ে মনের কষ্টিপাথরে সোনার দাগ দেখার মত কষছি।

"এবার কোথায় যাব মল্লিকা ?" বাইরে ট্যাক্সি ডাকার আগে প্রশ্ন করলাম।

"ডাকুন আগে ট্যাক্সি, তারপর বলব—"

ট্যাক্সি দাঁড়ালো এসে।

মল্লিকা বলল, "আউটরাম ঘাটের দিকে চল ড্রাইভার—"

"মল্লিকা।"

"ঘাটে গিয়ে কথা বলব শান্তনুবাবু।"

চুপ করে গেলাম। কি ভাবছে মল্লিকা ? কি যেন বলতে চায় সে ? প্রবীর মজুমদারের স্মৃতিকে সে মুছে ফেলতে চাইছে ? কিন্তু আমার দিকে তাকালে কি সেই স্মৃতিকে ভুলতে পারবে মল্লিকা ?

চুপ করে রইলাম। শুধু ট্যাক্সির ধাক্কায় আলোড়িত বায়ুবেগে মল্লিকার দেহসৌরভ মনের মধ্যে একটা স্নিগ্ধ উত্তেজনার সঞ্চার করতে লাগল। এবং আমার ইচ্ছে হল আরো ঘন হয়ে বসতে, মল্লিকার

কোমলতার স্পর্শ পেতে। কিন্তু আমি নড়তে পারলাম না, খালি ভাবতে লাগলাম যেন আমরা অন্ধকারে একটা বিস্তৃত নদীর বুকে নৌকোতে ভেসে চলেছি। নৌকোর পাল বায়ুবেগে ফুলে ফেঁপে উঠেছে, তীরবেগে এক বিচিত্র ঘাটের দিকে ছুটে চলেছে।

অবশেষে আউটরাম ঘাট এল।

মল্লিকা বলল, "পকেটে কত টাকা আছে ?"

আমি বললাম, "গোটা কুড়ি—"

"তাহলে ট্যাক্সি ছেড়ে দিন—পরে আবার আরো জায়গায় যেতে হবে—"

"কোথায় ?"

"সময় হলে বলব।"

ট্যাক্সি ছেড়ে দিলাম।

"আমার সঙ্গে চলুন—" মল্লিকা মৃদু গলায় বলল।

"তুমি কি যেন বলবে বলেছিলে মল্লিকা ?" আমার গলা কেঁপে উঠল।

"চলুন বলব।"

আমি তার পেছন পেছন চলতে লাগলাম। কখনো বা পাশে। সে যেন একটা ছন্দোময় গতির মত এগিয়ে চলল, যেন ভেসে চলল। যেন সে আমার বসন্তরাতের বিলীয়মান একটি স্বপ্ন।

গঙ্গার ঘাটে একটা নির্জনতর অংশে গিয়ে দাঁড়াল মল্লিকা।

"এখানে ?" প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ এখানে— এখানেই—" কি যেন বলতে গিয়ে সে থেমে গেল।

"এখানে কি ?"

"এখানে আসতাম—" সেই একই রকম মৃদু গলায় বলল মল্লিকা।

"তার সঙ্গে ?" আমি প্রশ্ন করলাম। আমার বলতে কষ্ট হল তবু বললাম।

"হ্যাঁ এখানে আসতাম—বসতাম, গঙ্গার জল কুলুকুলু নাদে বয়ে

যেত আর সে গুন্‌গুন্‌ করত ভালবাসার কথা—ভালবাসার কবিতা—"

আমার রক্তে ঈর্ষার বেগ সঞ্চারিত হল, আমি বললাম, "তার কথা থাক্‌ মল্লিকা—সে শঠ, সে প্রতারক—"

মল্লিকা তাকাল, বলল, "আপনিও ত তার মত দেখতে—"

"কিন্তু আমি শঠ নই, প্রতারক নই, লম্পট নই—"

"আমি জানি, আমি জানি, আজ আমি সব বুঝতে পারছি, সব বুঝতে পেরেছি—" বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল, সে মাটির ওপর বসে পড়ল, দু'হাতে মুখ ঢাকল।

আমিও বসলাম। আমার ঈর্ষা দূরে গেল। আমি তাকে তার আবেগ দমন করার সময় দিলাম, তাকালাম সামনে। অনন্ত তরঙ্গভঙ্গে সামনে বর্ষাকালের গৈরিকে মণ্ডিতা, ভরা গঙ্গা। যৌবনের সর্বনাশা গতিবেগে উগ্রচণ্ডা, কূলনাশিনী। তার ওপরে অসংখ্য নৌকো ভাসছে, দুলছে। তাদের আলোগুলো দুলছে। দূরে বড় বড় জাহাজের আলোছায়া। ধাবমান লঞ্চ। কোথায় যাচ্ছে এই গঙ্গা? সাগরে? মৃত্যু কি সাগরের মত? জীবন কি নদীর মত? এ জীবনও কি সাগর খুঁজছে? মৃত্যুরূপী সাগর? বাতাসে মল্লিকার দেহসৌরভ আমার চৈতন্যের নদীতে স্রোত-সঞ্চার করছে।

"মল্লিকা—তুমি কি বলতে চাও?"

"আমার অতীত কথা—"

"কি দরকার? আমার কাছে তোমার বর্তমানই একমাত্র সত্য, তোমার ভবিষ্যৎই আমার স্বপ্ন—"

"কিন্তু আমি যে বলতে চাই, অতীতকে আপনার কাছে ফেলে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই, অতীতের বন্ধন থেকে মুক্তি চাই—"

"তাহলে বল তুমি মল্লিকা—আমি শুনব।"

মল্লিকা মাথা নীচু করে ভাবতে লাগল। তারপর সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল। ক্ষীণ সেই শব্দে আমার বুকের তটে যেন কিছু ভেঙ্গে পড়ল। যেমন নদীর স্রোতে পাড় ধ্বসে পড়ে।

আমি বললাম, "মল্লিকা—"

"উঁ ?"

"আমার ইচ্ছে হচ্ছে মরে যাই—"

"কেন ?" আশ্চর্য এক দৃষ্টি মেলে তাকাল মল্লিকা, বলল, "কেন ?"

"কি জানি কেন ?"

"না, না, শান্তনুবাবু—মৃত্যুর কথা বলবেন না—বুঝেছি, আপনি আমার কথা শুনতে চান না !"

"না মল্লিকা, বল, আর কথা বলব না আমি !"

মল্লিকা আমার দিকে তাকাল, তাকিয়ে রইল। সে এক বিচিত্র দৃষ্টি। তীক্ষ্ণ, অন্তর্ভেদী।

"কি দেখছ ?"

"আপনাকে—"

"কিন্তু আমার মনকে তো দেখতে পাচ্ছ না।"

"তাও পাচ্ছি—মনকেই তো দেখছি—আপনি ভাল, আপনি সৎ, আপনি বিশ্বাসযোগ্য। কথা বলবেন না শান্তনুবাবু। শুনুন। আমার অতীতের কথা। যেন অতীত-জন্মের কথা। আমার বাবা শিবনাথ মিত্র গ্রাজুয়েট, তিনি প্রথম যৌবনে একটি বিলিতি ফার্মে চাকরি করতেন। মাইনে ভালই ছিল। আমার আগে দু'টি ভাই হয়েছিল, কিন্তু তারা দুজনেই বছর দুই হতে না হতেই মারা যায়। তারপর আমার জন্ম। আগে বাবা থাকতেন বৌবাজারে। সংসারে ঝামেলা ছিল না। বাবা, আমার মা মণিমালা আর এক দূর সম্পর্কের বুড়ী পিসী আর আমি। বছর কয়েক বাদে, আমার যখন ছ'সাত বছর বয়স তখন বাবার হাতে কিছু পয়সা জমেছিল। তিনি তাই দিয়ে হঠাৎ একদিন কসবার শেষপ্রান্তের ওই জমি কিনে বাড়ী তৈরী আরম্ভ করে দিলেন। সবাই নিষেধ করল কিন্তু বাবা শুনলেন না, তাঁর নির্জন ও গ্রাম্য পরিবেশটুকুই সব থেকে বেশী ভাল লেগেছে। বাড়ী হল। আমরা গেলাম সে বাড়ীতে। তখন রিফিউজী সমাগম শুরু হয়েছে, আস্তে আস্তে সেই ধূ-ধূ শ্বাসরোধী নির্জনতাও কমে এল। কিন্তু হঠাৎ বাবার চাকরি গেল। সায়েবরা তখন বিলেত ফিরে যাচ্ছে ব্যবসাপত্তর

গুটিয়ে। বাবার দুঃখের দিন শুরু হল। প্রায় বছর দেড়েক বসে থেকে অবশেষে তিনি একটি মাড়োয়ারী ফার্মে কেরানীর চাকরি পেলেন। কম মাইনে, কোনোমতে সংসার চলে যায় এইমাত্র। বাধ্য হয়ে দুটো মাস্টারীও নিলেন। আমি এই অভাবের মধ্যেই বড় হতে লাগলাম এবং দ্রুত আমার রূপান্তর হতে লাগল। ভালো খাবার, দুধ মাছ মাংস এ আমাদের সংসারে মাঝে মাঝে উৎসবের দিনের মত আসত। দুধ আসত শুধু আমার জন্য আর বাবামায়ের চায়ের জন্য। পিসীতো এই বাড়ীতে এসেই মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু অভাবে বড় হলেও প্রকৃতি কার্পণ্য করেনি একতিলও। বুদ্ধিতে, যৌবনশ্রীতে—কোনো দিক থেকেই নয়। লেখাপড়ায় আমি সবাইকে চমকে দিয়ে ভালো রেজাল্ট্ করতে লাগলাম। সবাই বলত আমি ভালো মেয়ে, সবাই বলত আমি রূপসী। আর আলোক সেন বলে একটি বখাটে ছোকরা আমায় দেখে বলত, 'মরে যাচ্ছি মাইরি।' কিন্তু একদিন পনেরো বছর বয়সে সেই আলোক সেনকেই চড় মেরে, কামড়ে, আঁচড়ে লোকসমাজে হেয় করে দিয়েছিলাম। আমার সাহস আর তেজ দেখে অন্যান্য পাজী ছেলেরাও তখন আলোককে তাড়া করেছিল। তারপর থেকে আমার আর কোনও বিপদ ছিল না, চিন্তা ছিল না। দারিদ্র ছিল কিন্তু তবু উচ্চাশার পথে বাধা সৃষ্টি হতে দেন নি বাবা। এইভাবে যখন ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠলাম তখন থেকে বাবার হাঁপানি ভয়ানক বেড়ে গেল। আমি প্রথম শ্রেণীতে ম্যাট্রিক পাশ করলাম, কলেজে পড়ার স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি—সেই ছোটবেলা থেকেই নাচেগানে আমার জুড়ি ছিল না কেউ। বাবা বলেন, 'আমার মল্লিকা যদি চব্বিশ ঘণ্টাই গায় আর নাচে তাহালে আমিও চব্বিশ ঘণ্টা না খেয়ে কাটাতে পারব।' নানা অনুষ্ঠান থেকে আমায় ডাকতে আসত কিন্তু বাবা সব জায়গায় যেতে দিতেন না। আমার অবশ্য খুবই ভালো লাগত। মানুষের হাততালিতে নেশা হয় শান্তনুবাবু। মনে মনে ভাবতাম এম.এ. পড়ব, রিসার্চ করে ডক্টরেট নেব সাহিত্যে, তারপর রেডিওতে গাইব, স্টেজে

মাঝে মাঝে নিজের নাচের দল নিয়ে নাচ দেখাব, তারপরে একদিন ইয়োরোপে, আমেরিকায়—। কিন্তু আমার সব ভাবনা সব কল্পনা আকাশকুসুম হয়েই রইল, ম্যাট্রিক পাশ করার পরই বাবার চাকরি গেল। হাঁপানির জন্য প্রায়ই তাঁকে কামাই করতে হত। অতি কষ্টে টিউশান করে তিনি কোনমতে একবেলার ডালভাতের বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। কিন্তু কলেজে পড়া আমার আর হল না। মাইনে দিতে হত না ঠিকই কিন্তু কলেজে যাতায়াত করব কি করে? তাছাড়া বই, খাতা, সাধারণভাবেও যে ভদ্র পোশাক পরতে হবে তা পাব কোথায়? বাবার মন ভেঙ্গে গেল। মা বেশী কথা বলেন না কিন্তু তিনিও ভেতরে ভেতরে পুড়তে লাগলেন। আমি তা দেখে একবেলার একটা মাস্টারী শুরু করলাম। রিফিউজী-পাড়ায় পয়সা দেবার মত লোক কোথায়—পনেরো টাকার বেশী আয় করতে পারতাম না। এইভাবে দু'বছর কাটল। আশ্চর্য, এত দুঃখেও আমার রূপ অম্লান রইল, আমার উৎফুল্ল যৌবন আরো উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আমি আমার যৌবনের উষ্ণতায়, রূপের গরবে গরবিনী হয়ে নিজেই নিজেকে দেখে মুগ্ধ হতাম, গাইতাম, নাচতাম। গাইতাম নাচতাম এই জন্যে যে ওইটুকুই ছিল আমার বাবার নির্মল আনন্দ। মা কিন্তু আমার গুণ যতই দেখতেন ততই ভয় পেতেন, ভেতরে ভেতরে পুড়ে পুড়ে খাক হতেন। তিনি মুখ ফুটে কিছু না বললেও আমি ঠিকই তার মনের কথা বুঝতে পারতাম। হয়ত মেয়ে বলেই। মা ভাবতেন, এত গুণ, এত রূপ, এই মেয়ের কি হবে? কোন ঘরে গিয়ে পড়বে? কে ওকে বিয়ে করবে? মনের মত ছেলে পাবে কোন ভাগ্যে? ঠিক এমনি সময়েই আমার ভাগ্যে প্রবীর মজুমদার এল। কিন্তু কি করে এল তার জন্যে জয়ন্ত বসুর কথা আগে বলে নিই—"

আমি চমকে উঠলাম, মাঝপথে বাধা দিয়ে বললাম, "জয়ন্ত বসু!"

"হ্যাঁ—" মল্লিকা বলে চলল, "এতদিনে আপনার সঙ্গে তার নিশ্চয়ই আলাপ হয়েছে। জয়ন্তদা খুব বড় লোক, ওদের নানারকম ব্যবসা আছে। অতি দূর হলেও সম্পর্কে সে আমাদের দাদা হয়। বাবা

মাঝে মাঝে যেতেন তার কাছে, নতুন কোনো কাজের খোঁজ পাবার চেষ্টায়। বাবা জোর করে তু'তিনবার আমাদের বাড়ীতে তাকে নিয়ে এসেছিলেন। খুব সৌখীন লোক, ভদ্র, আমাকে বেশ স্নেহ দেখাত কিন্তু তবু কেন জানি না আমার মনে হত যে জয়ন্তদার বোধহয় টাকার গরম আছে। একদিন সেই জয়ন্তদাই প্রবীর মজুমদারকে নিয়ে এল, আলাপ করিয়ে দিতে দিতে বলল, 'এ আমার বিশেষ বন্ধু, লক্ষপতি লোক, মানে ঐশ্বর্যে রাজপুত্র, রূপে কন্দর্প—আর প্রবীর, এই হচ্ছে মল্লিকা—অদ্ভুত গায়, অদ্ভুত নাচে—।' আমি প্রবীর মজুমদারের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। কী সুন্দর চোখ মুখ, কী সুন্দর গায়ের রং, কী সুন্দর তার হাসি! আমি দেখেই মুগ্ধ হলাম। ভালবাসার স্ফুলিঙ্গ তো বুদ্ধি থেকে ছিট্‌কে আসে না, আবেগ থেকে আসে। হঠাৎ প্রবীর মজুমদারকে দেখে মনে হল যে এতদিন যেন আমি আধো-ঘুম আধো-জাগরণের অবস্থায় ছিলাম। প্রবীর মজুমদারকে দেখেই যেন আমার পুরোপুরি জাগরণ হল। দেহে, মনে, রূপে, যৌবনে সব কিছুতেই যেন সেই জাগরণের পালা শুরু হল। প্রবীর চলে যেতেই মনে হল যে জয়ন্তদা যদি আবার না নিয়ে আসে প্রবীরকে তাহলে কি হবে? কিন্তু জয়ন্তদা তুদিন বাদেই আবার নিয়ে এল প্রবীরকে। আমি কি তখন ছাই বুঝতে পেরেছিলাম যে এসবই হিসেব করে করছিলো জয়ন্তদা—না না, এখন প্রশ্ন করবেন না শান্তনুবাবু, সবই যথাসময়ে বলছি। তু'দিন বাদেই এল জয়ন্তদা, সঙ্গে প্রবীর। বাবার সঙ্গে আলাপ হল তার। বাবা মুগ্ধ হলেন। মা অবশ্য কিছু বললেন না, বরাবরকার মতই নিঃশব্দ রইলেন। সেদিন প্রবীর যেতে চাইতেই বাবা বললেন, 'আবার এসো বাবা।' প্রবীর সম্মতি জানিয়ে চলে গেল। আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম, কিন্তু প্রবীর যদি না আসে তাহলে কি হবে? ভাবতে না ভাবতেই একদিন বাদে প্রবীর আবার এল। এবার একা। জয়ন্তদা নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। প্রবীর ক্রমেই আমাকে মোহগ্রস্ত করে তুলল। ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন থেকে সে অনর্গল আউড়ে যেত, বাবা ক্রমে তার গুণমুগ্ধ হয়ে পড়লেন। আমাকে সে উৎসাহিত

করতে লাগল নাচগানের ব্যাপারে, পড়ার ব্যাপারে। কলেজে ভর্তি হবার তখন সময় নয় তাই সে আমাকে ছেড়ে দিল নইলে হয়ত ভর্তি করিয়ে ছাড়ত। এখানে ওখানে দু একটা বড় জলসায় সে আমার নাচগানের ব্যবস্থা করে দিল। আমার নাম হল। আমি নিজেকে আরো ভালবাসলাম, সেই সঙ্গে প্রবীরকেও ভালবাসলাম। এদিকে সে অকৃপণ হাতে বাবাকে টাকার জোগান দিয়ে যাচ্ছিল, তাঁর মাস্টারী করা বন্ধ করেছিল। ক্রমেই আমার অন্তরে ভালবাসার ফুলটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত হল এবং একদিন সেই ফুলের সন্ধান পেল প্রবীর। তারপর সে গাড়ী নিয়ে আসতে লাগল। আমাকে নিয়ে সে বেড়াতে যেত। কখনো আমি বলে যেতাম বাড়ীতে, কখনো বা লুকিয়ে, মিথ্যে কথা বলে। এই গঙ্গার ঘাটে, ময়দানে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের আশে-পাশে, পার্কে, ব্যারাকপুরে, গড়িয়ার ওদিকে—"

হঠাৎ থেমে গেল মল্লিকা।

আমি বললাম, "থামলে যে ?"

মল্লিকা বলল, "এবার একটা ট্যাক্সি করুন শান্তনুৎ বু—গড়িয়ার দিকে চলুন—"

"কেন ?"

"সেখানেই আমার কথা শেষ করব—" মল্লিকার দুচোখ যেন জ্বলছে।

তাই করলাম। ট্যাক্সিতে বসলাম পাশাপাশি। সারা রাস্তা নিঃশব্দে অতিবাহিত হল। বালীগঞ্জ ছাড়িয়ে, যাদবপুর অতিক্রম করে গড়িয়ার দিকে যেতে যেতে মল্লিকার নির্দেশমত একটা রাস্তা ধরে একটা বাগান-ওয়ালা বাড়ীর কাছাকাছি গিয়ে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে আমরা নামলাম।

"এই বাগানের কাছাকাছি আসুন—" মল্লিকা বলল।

আমি তার অনুসরণ করলাম। দেখলাম একটি সৌখীন ও ছোট একতলা বাড়ী।

"এটা প্রবীর মজুমদারের বাগান বাড়ী—" মল্লিকা বলল, "ভালবাসায় আমি যখন হাবুডুবু খাচ্ছি তখন একদিন এখানে আমায়

নিয়ে এল প্রবীর। বাড়ীতে চাকর ছিল, সে চা দিয়ে গেল। আমি চা খেলাম, তারপর আমার কেমন যেন ঘুম-ঘুম পেতে লাগল। প্রবীরকে এই কথা বলতে সে বলল একটু গড়িয়ে নিতে। তখন সন্ধ্যেবেলা। ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন দেখি রাত অনেক হয়েছে। তখন দেখলাম যে আমি প্রবীরের আলিঙ্গনপাশে, একই শয্যায়। প্রথমে ভয় পেলাম, রাগ করলুম কিন্তু তা সত্ত্বেও রক্তে জোয়ার এল, আমার বিবেক আমার অন্ধ ভালবাসার স্থূল বাসনার কাছে আত্মসমর্পণ করল। প্রবীর তো কতদিন তার আগে বলেছে যে সে আমায় বিয়ে করবে। সেদিনও সে বলল যে এক মাসের মধ্যেই বিয়ের তারিখ ঠিক করছে সে। আশ্চর্য, আজ ভেবে অনুতাপ হয় যে এর মধ্যে, এই পাঁচ ছ' মাসের অন্তরঙ্গতার মধ্যে একদিনও আমি বা বাবা কেন গেলাম না প্রবীরের বাড়ীতে! বাবাও বিশ্বাস করে বসে ছিলেন যে প্রবীর আমায় বিয়ে করবে। সেই রাতের পর বাড়ী ফিরে নানা মিথ্যে কথা বললাম। তারপর আরো ভেসে গেলাম কদিন। প্রবীর বিয়ের তারিখ ঠিক করতে সময় নিতে লাগল। একমাসের জায়গায় তিনমাস কেটে গেল। হঠাৎ একদিন মা আমার হাত চেপে ধরে বললেন, 'সর্বনাশী, তোর লক্ষণ যে ভালো নয়।' আমি বুঝলাম না, কদিন শরীর কেমন করত বটে, মাথাটা ঘুরত বটে—কিন্তু তাকে আমল দিইনি আমি। এবার মায়ের কথায় যেন সব পরিষ্কার হয়ে গেল আর সেই সময়েই বাবা ফিরে এলেন বাড়ী। তাঁর মুখ গম্ভীর, থমথমে। আমাদের পাড়ার সেই আলোক সেন তাঁকে বলেছে যে প্রবীর মজুমদার নামক যে লোকটির সঙ্গে আমি ঘুরে বেড়াই সে বিবাহিত। বাবা প্রথমে বিশ্বাস করেননি, তিনি ঠিকানা জোগাড় করে খোঁজ নিয়ে দেখেছেন যে আলোক মিছে কথা বলেনি। আলোক সেন এতদিনে প্রতিশোধ নিল আমার ওপর। আমার চোখের সামনে সব কিছু অন্ধকার হতে গিয়েও কিন্তু হল না। আমি প্রবীরকে বিশ্বাস করি, ভালবাসি। তাই তার বাড়ী গেলাম। শুনলাম সে নেই, পুরী গেছে। আমি তার ঠিকানা নিয়ে পুরীর এক হোটেলে গিয়ে তাকে ধরলাম।

তার পায়ে পড়লাম। সে আমার কথা শুনে যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল, তারপর আমায় নিয়ে কলকাতায় ফিরে এল এবং সোজা এক ডাক্তার বন্ধুর কাছে নিয়ে গেল। তাঁর চেম্বার বালীগঞ্জে। ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে আমায় নিয়ে একটা পার্কে বসে সে বলল যে সে বিবাহিত হয়েও আমাকে না ভালবেসে পারেনি। সে শঠতা করেছে বটে তবে তা সাময়িক। সে তার স্ত্রীকে ডাইভোর্স করবে এবং তারপরে আমায় বিয়ে করবে, সে আমায় ছাড়া জীবনযাপন করতে পারবে না। কিন্তু যতদিন না ডাইভোর্স হয় ততদিন কি হবে? তার চেয়ে ঐ ডাক্তারের সাহায্যে যদি—। আমি আর্তনাদ করে উঠলাম। সে ভয় পেল, বলল আবার বিকেলে দেখা করবে। আমি বাড়ী ফিরে গেলাম। বাবা তখন আমার অবস্থা জানেন। তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন এবং নিজের মনেই মাঝে মাঝে বিড়বিড় করছেন। প্রবীর বিকেলে এল না, তার পরদিনও নয়। আমি প্রবীরের বাড়ীতে গেলাম, শুনলাম যে সেদিন সকালে সে প্লেনে চড়ে বোম্বাই গেছে, ফিরবে পাঁচদিন পরে। আমি তার মায়ের সঙ্গে দেখা করলাম, দেখা করতে গিয়ে তার রূপসী স্ত্রীকেও দেখলাম। প্রবীরের মা অত্যন্ত ভদ্রভাষায় আমায় একটি চরিত্রহীনা বলে তাড়িয়ে দিলেন এবং বললেন যে ব্ল্যাকমেইল করতে চাইলে আমি বিপদে পড়ব। আমি জয়ন্তদার কাছে গেলাম। সে সব শুনে হেসে বলল, 'এত ভাববার কি আছে, সেই ডাক্তারের কাছে যা—পরে দেখে নেব আমি।' আমি ঘেন্নায় চলে এলাম। মা জিজ্ঞেস করলেন, হাঁরে, কি হল? কি করবি? ওরে মুখপুড়ী, এ কী সর্বনাশ করলি?'—তারপর আমি বোধ হয় পাগল হয়ে গেলাম, আমি পাগল হয়ে দিন গুনতে লাগলাম। আমি বাবার দিকে তাকাতে পারিনে, মায়ের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াই, বাইরে বেরোতে ভয় পাই—"

মল্লিকা থামল হঠাৎ, বলল, "এবার আমি বাড়ী যাব শান্তনুবাবু—"

"কিন্তু শেষ করলে না যে?"

"পরে—পরে বলব—আমি এখন আর বলতে পারছি না—আমার কষ্ট হচ্ছে, দোহাই আপনার—"

"আচ্ছা মল্লিকা—চল—"

আবার ট্যাক্সিতে চড়লাম। বালীগঞ্জ স্টেশনে নামলাম তুজনে। লেভেল ক্রসিং পার হতে যাচ্ছি, মল্লিকা বলল, "না, আপনি আর আসবেন না—"

"পৌঁছে দিই—"

"না না, না—" হঠাৎ যেন হিংস্রতা নেমে এল মল্লিকার মুখেচোখে, বলল, "আপনি বড় অবাধ্য শান্তনুবাবু—আমার দেরী হয়ে গেছে, এবার যেতে দিন—"

যাদবপুরের দিক থেকে একটা ইঞ্জিন আসছিল। মল্লিকা এগোল।

"আমি বললাম, "দাঁড়াও—"

"না—" মল্লিকা ছুটল।

"আবার কাল দেখা হবে?" আমি চেঁচালাম।

"জানি না—" বলতে বলতে লাইন পার হয়ে গেল মল্লিকা, আর ইঞ্জিনটা তারপরেই এসে গেল। আমি এগোতে পারলাম না। ইঞ্জিনটা সশব্দে, হুইসল বাজিয়ে শিয়ালদার দিকে এগিয়ে যেতেই আমি তাকালাম সামনের দিকে। মল্লিকাকে আর দেখা যাচ্ছে না।

ভাবলাম যে কথা শেষ না করেই ওভাবে অস্থির হয়ে কেন ছুটে পালাল মল্লিকা? হঠাৎ ইচ্ছে হল যে ওর বাড়ী যাই, গিয়ে শুনি সব কথা।

রাস্তা চেনাই ছিল। এগোলাম। সেই শ্রীধর মুখুজ্জে রোড। সেই বাঁক। সেই টাকমাথা ফুলুরিওয়ালা। আজো সে একা একা মাথা নীচু করে ফুলুরি ভাজছে, দোকানে কোনো ক্রেতা নেই।

সেই দোকানের পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছি তখন সেই টাকমাথা মুখ না তুলেই বলল, "নয়ের নয়েতে কেউ নেই।"

"এ্যাঁ?" আমি থমকে দাঁড়ালাম।

"হ্যাঁ—কেউ নেই, সবাই বাইরে গেছে।"

"কিন্তু মল্লিকা এইমাত্র ফিরল যে!"

ফেরেনি।"

"আমি জানি যে—এইমাত্র—"

"আমি জানি না তাহলে—"

আমি এগিয়ে গেলাম। চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করাই ভালো। কিন্তু পুকুরধারে পৌঁছেই দেখলাম যে টাকমাথার কথাই ঠিক। মল্লিকার বাড়ী অন্ধকার, দরজা জানালা সব বন্ধ। কিন্তু এইমাত্র যে—তাহলে কোথায় গেল মল্লিকা? আচ্ছা রাস্তা ধরে ধরে বালীগঞ্জের দিকে ফিরে চলি, হয়ত দেখা হয়ে যাবে।

আবার সেই টাকমাথার দোকানের পাশ দিয়ে ফিরে গেলাম। কিন্তু মল্লিকার সঙ্গে আর দেখা হল না। কোথায় গেল সে? ভাবলাম যে হয়ত তার বাপ মা কোথাও নেমন্তন্নে গেছেন, মল্লিকাও সেখানে গেছে, এক সঙ্গেই সবাই ফিরবে।

আমি একটা ট্যাক্সি নিলাম। তারপর সোজা উডবার্ণ পার্কের দিকে। মনটা ভার লাগতে লাগল। বেচারী মল্লিকা! আচ্ছা মল্লিকা কি আমাকে কোনদিন ভালবাসতে পারবে না। সে তো আমার প্রশংসা করল, সে তো আমার মন দেখতে পাচ্ছে বলল!

'মায়া-কুঞ্জে' ঢুকলাম। ট্যাক্সি থেকে নামতেই দেখি যে বারান্দায় ভীড়। চাকরবাকরেরা দাঁড়িয়ে আছে, একটি চেয়ারে একজন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর বসে আছে। তার কোমরে রিভলবার। দু'জন কনেস্টবল দাঁড়িয়ে তার কাছাকাছি। আমি সেদিকে এগোতেই ইন্‌স্পেক্টরটি উঠে দাঁড়াল। ড্রয়িংরুমের ভেতর থেকে সঙ্গে সঙ্গেই মিসেস মজুমদার বেরিয়ে এলেন, তাঁর পেছনে রমা। তাঁদের চোখে উৎকণ্ঠা।

"কি ব্যাপার মা?" আমি প্রশ্ন করলাম।

ইন্‌স্পেক্টরটি প্রশ্ন করলেন, "আপনিই শান্তনু রায়?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"আমরা আপনাকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করতে এসেছি—"

"কি! তার মানে—কার খুন?" আমি বিমূঢ়ের মত তাকালাম।

"প্রবীর মজুমদারকে আপনিই খুন করেছেন—"

"আমি!" ইচ্ছে হল হাসি, তবু ভয়ে কেঁপে উঠলাম।

মিসেস মজুমদার কেঁদে ফেললেন, বললেন, "মিছে কথা বাবা—এ কোনো শত্রুর কাজ—আমি জানি তুমি নির্দোষ, তুমি নির্দোষ—"

॥ নয়

হ্যাঁ, আমাকে রীতিমত গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল পুলিশ। সেই রাতেই। থানার হাজতে আমি তালাবদ্ধ হলাম। নাটকের এই দৃশ্যের জন্য আমি আদৌ তৈরী ছিলাম না কিন্তু। তবে, একটা লাভ হল। আপাতত সেই অদৃশ্য আততায়ীর হাত থেকে বাঁচলাম। হাজতের সেই ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় বসে বসে আমি মাথা ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করলাম, ভাবলাম যে আমার ভয়ের কিছুই নেই। আমি তো খুন করিনি।

জেরা অনেক হয়েছিল। তা থেকে বুঝতে পারলাম যে পুলিশের ধারণা এই যে প্রবীর মজুমদারের সঙ্গে আমার চেহারা মেলে বলে আমিই তাকে খুন করেছি তার বাড়ীতে ভবিষ্যতে প্রবীরের স্থান দখল করে মজুমদারদের অগাধ সম্পত্তির মালিক হবার জন্য। মিসেস মজুমদারের ঘোষণাকে তারা আপাতত আমল দিচ্ছে না। তদন্ত চলবে, তারপর যা বিশ্বাস করার করা হবে।

ইন্‌স্পেক্টর মিঃ দত্ত লোক ভাল, তিনি বললেন, "এতো রীতিমত গল্প মশাই—যাই হোক, মনের বল হারাবেন না—আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি তদন্ত করার—"

আমি অফিসারটিকে অনুরোধ করলাম যাতে বাবা না জানতে পারেন। ভদ্রলোক কথা দিলেন।

পরদিন সকালেই নামজাদা উকীল মিঃ বিশ্বাসকে নিয়ে মিসেস মজুমদার হাজতে এসে দেখা করলেন। মিঃ বিশ্বাস আমায় অভয়

দিলেন।

প্রায় দিনসাতেক বাদে আমি জামিনে ছাড়া পেলাম। মিসেস মজুমদার জামিন হলেন। তারপর 'মায়া-কুঞ্জে' সে কী অভ্যর্থনা! চাকরবাকরদের লক্ষ্য করে দেখলাম যে আমি আসল প্রবীর মজুমদার নই জানার পর তাদের সম্ভ্রমবোধ যেন আরো বেড়েছে।

আমি জানতে পারলাম যে আমার জবানবন্দী আপাতত তদন্ত করে সত্য প্রমাণিত হওয়ায় ছাড়া পেয়েছি কিন্তু জের এখনো শেষ হয়নি।

ক'দিন হাজতে থাকার দরুণ বাবাকে চিঠি লেখা হয়নি। যখন সেই চিঠি খাওয়াদাওয়ার পর লিখছিলাম তখন হঠাৎ রমা এসে দাঁড়াল ঘরে।

"আপনি!"

"আপনার খুব কষ্ট গেছে এ ক'দিন—" রমা বলল। তার সেই সুদূর চাহনি মেলে।

আমি হেসে বললাম, "আপাতত কষ্টের তো এক পর্ব শেষ হয়েছে—"

রমা কথা বলল না, খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমায় দেখল তারপর কিছু না বলেই চলে গেল। কিন্তু এই কয়েক মুহূর্তেই তার যৌবন ঘরের মধ্যে যেন এক উত্তাপ ছড়িয়ে গেল। বাসনার উত্তাপ। তা আমার আর এক মনকে বিচলিত করে তুলবার চেষ্টা করতেই আমার মল্লিকার কথা মনে পড়ল। কি হল মল্লিকার? সে হয়ত জানেই না আমার কি ভোগান্তি গেল। ভাবলাম যে আজ দেখা করব তার সঙ্গে।

বিকেলে 'মায়া-কুঞ্জ' থেকে বেরোলাম কাউকে না বলে। বললেই হয়ত মিসেস মজুমদার বাধা দেবেন। তাছাড়া আমাকে গ্রেপ্তার করার খবরও নাকি একটা কাগজে বেরিয়েছে। ভয় হতে লাগল বাবা না টের পান, তবে যে কাগজে বেরিয়েছে তা পাটনায় খুব কম চলে এবং তাতে আমার পুরো পরিচয় নেই।

রাস্তায় বেরিয়ে কয়েক পা এগোতেই হাওয়া এল। সঙ্গে সেই

সুবাস। মনে মনে বললাম, মল্লিকা।

"শুনুন—শান্তনুবাবু—" মল্লিকার ডাক শুনতে পেলাম।

ঘুরে দেখি মল্লিকা এগিয়ে আসছে। মুখে হাসি।

"আপনার সঙ্গে দরকারী কথা আছে—" সে বলল।

কী সুন্দর দেখাচ্ছে মল্লিকাকে! কিন্তু একটু রোগা-রোগা লাগছে যেন!

"কি কথা মল্লিকা?"

"ঐ পার্কে চলুন—"

আমরা উডবার্ণ পার্কে গিয়ে বসলাম এক কোণে।

বললাম, "তোমার ওখানেই যাচ্ছিলাম—"

"পেতেন না।"

"পেলাম তো—" বললাম, "এ ক'দিন তুমি কোথায় ছিলে?"

"ছিলাম এখানেই—"

"আমার কী হয়েছিল জানো?"

"জানি। কাগজে পড়েছি। আজ যে ছাড়া পেয়েছেন সেই খবর জেনেই এসেছি—"

"কি করে জানলে?"

"জানি—মানে জানতে পাই আমি—আমার চারদিকে নানা গুপ্তচর আছে—"

মল্লিকা হাসল। হাসলে তাকে যেন এ জগতের মানুষ বলে মনে হয় না।

"শুনুন—কথা আছে।"

"বল মল্লিকা—"

মল্লিকা যা বলল তা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। প্রবীর মজুমদারের হত্যাকারী কে তা সে জানতে পেরেছে। কি করে? তার জবাব সে দিল না, রহস্যময় হাসি হেসে এড়িয়ে গেল। বলল যে পরে বলবে, আগে হত্যাকারী ধরা পড়ুক। সে প্রবীর মজুমদারের প্রতি আসক্তিবশত এই ব্যাপারে উৎসুক নয়, আমাকে সর্বপ্রকারে বিপন্মুক্ত

দেখতে চায়। সে বলল যে হত্যাকারী থাকে বর্ধমানে এবং তার নাম ঠিকানা দিয়ে বলল যে—ইন্‌স্পেক্টর মিঃ দত্তের সঙ্গে গিয়ে আমি দেখা করলেই তিনি রাজী হবেন তদন্ত করতে।

"আচ্ছা যাব কাল—" আমি বললাম।

"কাল নয়, আজ, এখুনি চলুন আপনি।"

"তোমার সঙ্গে যে গল্প করতে ইচ্ছে হচ্ছে মল্লিকা—"

"আমি যা বলছি সেইমত না করলে কিন্তু আর দেখা হবে না।"

"আবার কাল দেখা হবে ?"

"কাল কিনা জানি না তবে হবে দেখা শান্তনুবাবু।"

মল্লিকা উঠে দাঁড়াল। আমি বাধ্য হয়ে বিদায় নিলাম। তারপর গেলাম আমি থানায়।

মিঃ দত্ত আমায় দেখেই বললেন, "ভালই হয়েছে—একটা উদ্ভট খেয়াল চেপেছে আমার মাথায় মিঃ রায়—"

"আজ্ঞে ?"

ইন্‌স্পেক্টর দত্ত প্রকাশ করলেন যে প্রবীর মজুমদারের খুনের কেসটা তার কাছে খুব আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে। তিনি সম্প্রতি একটি উড়ো চিঠি পেয়েছেন, একটি স্ত্রীলোকের লেখা। তাতে লেখা আছে একজনের নামধাম এবং সে-ই নাকি প্রবীর মজুমদারের হত্যাকারী। স্ত্রীলোকটি হয়ত মজুমদারদের পরিবারভুক্ত কিংবা হত্যাকারীদের গণ্ডীর কেউ।

আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে এ চিঠি মল্লিকার।

ইন্‌স্পেক্টর দত্ত বললেন, "কাল আপনি সন্ধ্যেবেলা এখানে আসবেন—আপনাকে নিয়ে আমি বর্ধমান যাব—"

"কিন্তু আমায় কেন ?"

"দরকার আছে—আচ্ছা বলেই ফেলি, প্রবীর মজুমদারের হত্যাকারী কাল ভূত দেখবে রাত একটার সময়—" ইন্‌স্পেক্টর সহাস্যে বললেন, "যদি চালটা লেগে যায় তাহলে আপনারই ষোল আনা মঙ্গল মশাই—"

আমি হেসে বললাম, "আর আপনার প্রমোশনটা কত আনা মঙ্গল ?"

মিঃ দত্ত হো হো করে হেসে উঠলেন।

থানা থেকে বিদায় নিয়ে আমি বাড়ীর দিকেই ফিরে চললাম। তখন সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে। চলতে চলতে ভাবতে লাগলাম মল্লিকার কথা। কি করে জানল মল্লিকা এসব ? এসব কি সত্যি ? কেমন যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। চাইছি অথচ পারছি না।

মল্লিকার কথা ভাবতে ভাবতে রাস্তা দিয়ে চলছি, হঠাৎ দেখি সামনের দিক থেকে মল্লিকা প্রায় ছুটে আসছে।

"মল্লিকা !"

"চুপ—কোনো কথা নয়, আমার পেছু পেছু আসুন—"

"কি হয়েছে ?"

"কথা নয়—"

বড় উত্তেজিত মনে হল তাকে। সে দ্রুতপদে গলির মধ্যে ঢুকল, আমি তার পেছু নিলাম। সে এত তাড়াতাড়ি ছুটছে যে আমি বড় বড় পা ফেলেও তাকে ধরতে না পেরে অবাক হয়ে গেলাম। গলিটা এঁকেবেঁকে গেছে। মল্লিকা চলতেই লাগল। এক জায়গায় গলিটা আর একটা গলিতে পড়েছে। সেখানে ডানদিকে ঘুরল মল্লিকা। তারপরে একটা বাড়ীর পাশের অন্ধকার কানাগলিতে সে ঢুকল। সেখানে কেউ নেই। আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম, তার দেহসৌরভ পেলাম। সেই ফুলের গন্ধ।

"কি হয়েছে মল্লিকা ?"

"চুপ্—পরে বলছি।"

সে আমার কাছে সরে এল, ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "একটা লোক আপনার পেছু নিয়েছে—এখুনি দেখবেন—"

সে কি ব্যাপার ? নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল উত্তেজনায়। গলিতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। তাকালাম। দূরে একটা শক্ত সমর্থ বছর তিরিশের ট্রাউজার পরিহিত লোক এসে দাঁড়াল। সে চারদিকে

তাকিয়ে কি যেন দেখছে, খুঁজছে। মল্লিকা আমায় টেনে আরো অন্ধকারে নিয়ে গেল। আমি তার স্পর্শ পেলাম, রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম। ওদিকে সেই লোকটা কি যেন ভাবছে মনে হল, তারপর সে যেদিক থেকে এসেছিল সেই দিকেই আবার ফিরে গেল, তার পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল।

আরো কয়েকটা মুহূর্ত। উত্তেজনার এবং রোমাঞ্চের। ভয় এবং আনন্দের। আমি তাকালাম মল্লিকার দিকে। মল্লিকার চোখ ছুটো যেন আকাশের তারা। আশ্চর্য এক দিব্য অনুভূতি আমায় অবশ করে তুলেছে। মনে হচ্ছে আমি মরে যাই।

আমি হঠাৎ বলে ফেললাম, "মল্লিকা, আমি তোমায়—"

মল্লিকা আমার মুখে হাত দিয়ে বলল, "এখন কিছুই বলবেন না—পরে, পরে শুনব—চলুন, দেখি লোকটা গেল কিনা—"

আমি লজ্জা পেলাম। এই কি প্রেমের কথা বলার সময়? মল্লিকা কি ভাবল কে জানে? পা টিপে টিপে এগোল মল্লিকা, তারপর সামনের গলিতে এগিয়ে গেল আমায় দাঁড়াতে বলে। চারদিকে ভালো করে দেখে সে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকল। আমি গলিতে গিয়ে দাঁড়ালাম।

"শিগ্গীর—ঐ গলি দিয়ে চলুন—"

আর একটা গলি ধরে বড় রাস্তায় পড়লাম আমরা।

মল্লিকা বলল, "সোজা ট্যাক্সিতে করে বাড়ী যান। কাল বেরোবেন না কোথাও। ইনস্পেক্টর কি বলেছেন?"

আমি সংক্ষেপে মল্লিকাকে বললাম সব কথা।

"বেশ তাহলে আবার পরশু দেখা হবে—সন্ধ্যেবেলা বাড়ীতে থাকব—আমি চলি এখন—"

"চল, পৌঁছে দিই মল্লিকা—"

"না, আমায় একা যেতে হবে, দোহাই আপনার আপনি যান, বিপদ এখনো কাটেনি—"

"মল্লিকা, তুমিই কি চিঠি দিয়েছ থানায়?"

"ওসব কথার এখন সময় নেই—আজ যান—এই যে ট্যাক্সি—"

একটা ট্যাক্সি আসছিল। সেটাকে দাঁড় করিয়ে আমি উঠে বসলাম। মল্লিকা দাঁড়িয়ে রইল। আমার ট্যাক্সি এগিয়ে গেল।

সেদিন রাতে মিসেস মজুমদারের কাছে খুব বকুনী খেলাম। তাঁকে সেই পশ্চাদ্ধাবনকারীর কথা ইচ্ছে করেই বললাম না।

সেই রাতে, প্রায় এগারোটার সময় আমি ওপরের বারান্দায় আবার লঘু পায়ের শব্দ পেলাম। কিন্তু আমি আমার কৌতূহলকে দমন করলাম। যদি কোনো বিপদ ঘটে। জানালা দরজা ভালো করে দেখে নিলাম আমি। না, কোনো ভয়ের সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া চাকরেরা সতর্ক আছে, পুলিশ আছে, গুর্খা আছে।

কিন্তু রাত প্রায় তিনটে নাগাদ বাগানে হৈ চৈ হল। মিসেস মজুমদারের ডাকে দরজা খুললাম, শুনলাম কে নাকি বাগানে ঢুকেছিল কিন্তু পুলিশ এবং গুর্খার তাড়াতে পালিয়ে গেছে। শুনে মল্লিকার কথা মনে পড়ল আমার, একটা বিচিত্র স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে পড়ল আমার চেতনায়। মল্লিকা, আমি তোমায় ভালবাসি। এই নাটকের যবনিকা-পাত ঘটলেই কি তুমি আমার হবে? প্রবীর মজুমদারের সন্তান? সে কি বেঁচে আছে? থাকলেই বা, মল্লিকার জন্য আমি সব সংস্কারকে বিসর্জন দেব। বাবা? আমি তাঁর পায়ে ধরে অনুমতি চাইব। মল্লিকা, আমি তোমায় ভালবাসি।

পরদিন মিসেস মজুমদারকে বললাম যে দারোগা ডেকেছেন। ইম্পালায় বসে থানায় গেলাম ও গাড়ী ছেড়ে দিলাম। তারপর পুলিশের জীপে বসে হাওড়া স্টেশন গেলাম। ইন্‌স্পেক্টর মিঃ দত্ত, দু'জন কনেস্টবল ও একজন জমাদার নিয়ে চললেন। তাঁর কাছে একটি রিভলবার।

রাত ন'টায় আমরা বর্ধমান পৌঁছলাম। একটা হোটেলে খাওয়া দাওয়া সেরে সেখানেই এগারোটা পর্যন্ত বসে আমরা বেরোলাম। স্থানীয় একটা থানায় গিয়ে সেখানকার দারোগাকে কি সব গোপনে

বললেন মিঃ দত্ত। থানায় বসে রইলাম আমরা। রাত সাড়ে বারোটার পর আমরা বেরোলাম সতীশ মল্লিক লেনের দিকে। সঙ্গে স্থানীয় থানার দু'জন কনেস্টবল যোগ দিল।

ঘিঞ্জি গলিটা। পুরোন আমলের সব বাড়ী। বেশীর ভাগই একতলা। গলিতে একটা বাগান। সেই বাগানে আমরা লুকিয়ে রইলাম। শুনলাম যে, যার খোঁজে আমরা এসেছি তার নাম বিনোদ সাহা। সে এখনো নাকি বর্ধমানে ফেরেনি, স্টেশনে স্থানীয় ও এই পাড়ার একজন লোক (আসলে সি আই ডি-র লোক) অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে, বিনোদ গাড়ী থেকে নামলেই তার সঙ্গে গল্প করতে করতে এই বাগান দিয়ে নিয়ে যাবে। বাগানের কাছাকাছি এলেই সেই ভদ্রলোক একটি রামপ্রসাদী গান ধরবে। গান শুনলেই আমাকে প্রবীর মজুমদারের প্রেত সাজতে হবে। কি কি করতে হবে তা আমি আগেই থানায় জেনে নিয়েছিলাম।

ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলল। মশা চারদিকে, হাত পা জ্বলতে লাগল তাদের কামড়ে। একটা উত্তেজনায় শরীর তখন ঝিম্‌ঝিম্ করছে ঝিঁ ঝিঁ পোকাদের ডাকের তালে তালে।

একটা বাজল। দূরে কতকগুলো কুকুরের চীৎকার শোনা গেল। তারপরেই গান ভেসে এল, 'আমায় দে মা তবিলদারী-ই-ই্—'।

ইন্‌স্পেক্টর দত্ত আমায় ঠেলা দিলেন। আমি বাগানের মাঝামাঝি একটা আমগাছের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। দূরে দুটো মানুষকে দেখা গেল। একজন ধুতিপরা, দ্বিতীয় জন ট্রাউজারপরা। আমি চিনতে পারলাম তাকে। গতকাল যে লোকটি আমার পেছু নিয়েছিল সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি।

ওরা কাছাকাছি এগিয়ে এল।

গলির শেষের ইলেকট্রিক আলোর শেষ রেশটুকু যেখানে ছিল সেখানে আমি বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম, মোটা গলায় বললাম, "বিনোদ —আজ এতদিনে প্রতিশোধ নেব—"

"কে ?" বিনোদ সাহা থমকে দাঁড়াল।

তার সঙ্গী হঠাৎ কাঁপতে আরম্ভ করল, আর্তকণ্ঠে বলল, "ভূ-ভূ—ভূত—ভূত—জয় রাম, জয় রাম—"

"যাঃ—কি বলছিস—কে হে তুমি?" বিনোদ আবার এগিয়ে আসতে লাগল।

আমি বললাম, "আমি প্রবীর মজুমদার বিনোদ—আজ প্রতিশোধ নেব—"

"প্রবীর!" বিনোদ আবার থমকে দাঁড়াল।

"ভূ—ত!" বলেই বিনোদের সঙ্গী মাটিতে পড়ে গেল। যেন মূর্চ্ছা গেল।

আমি বললাম, "মনে পড়ছে না বিনোদ? বোম্বাইয়ের কাছাকাছি—নাসিকের জঙ্গলে—"

বিনোদ আমায় [illegible] মজুমদারকে চিনতে পেরেছে। তার চোখে ভয় ঘনাল। [illegible] ম।

"বিনোদ কথা বলছ না যে! তৈরী হও—"

হঠাৎ বিনোদ হাঁটু গেড়ে বসল, ফিস্‌ফিস্ করে বলতে লাগল, "আমার দোষ নেই, জয়ন্তবাবু, আপনার বন্ধু আমায় বলেছিল—"

"কত টাকা পেয়েছিলে?"

"দু'—দু' হাজার টাকা—"

"কিন্তু টাকার লোভে একজনকে খুন করলে! আমি কি তোমার কোনো ক্ষতি করেছিলাম বিনোদ?"

"না না না—"

"তাহলে তৈরী হও— তোমায় আজ আমি মারব—"

"না না না—দোহাই—"

"আর রক্ষে নেই বিনোদ—" বলে আমি দু' হাত বাড়িয়ে এগোলাম, "তোমায় খুন করার জন্য আমি অনেকদিন ধরে অনেক দূর থেকে এসেছি—"

"না না না—" বলতে বলতে বিনোদ দৌড়োবার চেষ্টা করতেই ইন্‌স্পেক্টর দত্ত রিভলবারের গুলি চালালেন। অবশ্য শূন্যে। বিনোদ

থমকে দাঁড়াল। কনেস্টবলরা বেরিয়ে এল। রিভলবার উঁচিয়ে মিঃ দত্ত এগিয়ে গেলেন বিনোদের দিকে।

"পুলিশ !" বিনোদ আর্তকণ্ঠে উচ্চারণ করল।

মিঃ দত্ত বললেন, "হ্যাঁ—তুমি প্রবীর মজুমদারকে খুন করেছ—তোমায় গ্রেপ্তার করলাম—"

বিনোদ মাথা ঘুরে পড়ে গেল। যে ভদ্রলোক মূর্চ্ছার ভাণ করেছিল সে এবার উঠে দাঁড়াল।

জ্ঞান ফিরবার পর বিনোদ সব স্বীকার করল। অবশ্য যে প্রক্রিয়ায় পুলিশ মাঝে মাঝে স্বীকৃতি আদায় করে তারও প্রয়োগ করতে হল।

বিনোদের কাছে জানা গেল যে জয়ন্ত বসুই তাকে নিয়োগ করেছিল কলকাতায। প্রবীর মজুমদারকে বোম্বাই পর্যন্ত অনুসরণ করে জয়ন্ত। বোম্বাইতে কয়েকজন ওদেশী বন্ধুদের ও তিনটি মেয়েকে সঙ্গে করে শিকারের জন্য নাসিকের জঙ্গলের দিকে যায় প্রবীর মজুমদার। জয়ন্ত বসু তাকে আগে থাকতেই বলে দি.যছিল প্রবীর মজুমদার কোথায় কবে যাবে। সেই অনুযায়ী দাদরের একজন নামজাদা গুণ্ডাকে আগে থেকেই চিঠি দিয়েছিল বিনোদ। তার নাম মধুকর কালেলকার। তাকে দেওয়া হয় এক হাজার টাকা। তারা দুজনে নাসিকের জঙ্গলে গিয়ে একদিন বসে ছিল। তারপর প্রবীর যখন শিকার করতে গিয়ে একা হয়ে পড়ে তখন দু'জনে মিলে আক্রমণ করে তাকে। প্রবীর মজুমদার চেঁচাবারও সুযোগ পায়নি। তার পিঠে বিনোদই ছোরা মেরেছিল তারপর জঙ্গলের ভেতর তারা পালায়। দু'জনে দু'দিকে। মধুকর কালেলকারের বর্তমান ঠিকানাও বলল বিনোদ এবং স্বীকার করল যে আমাকে খুন করার চেষ্টাও সে ক'দিন ধরে করছিল। বিনোদকে বর্ধমানের হাজতে রেখে ভোর হবার আগেই সেখানকার জীপ নিয়ে মিঃ দত্ত কলকাতায় ছুটলেন আমাকে নিয়ে। ভোর হবার আগেই জয়ন্ত বসুকে গ্রেপ্তার করার জন্যে।

রাত তিনটেয় বেরিয়ে আমরা প্রায় পৌনে পাঁচটায় ভবানীপুরে পোঁছোলাম।

তখনো আলো জ্বলছে রাস্তায়, অন্ধকার আছে।

জয়ন্ত বসুর বাড়ী ঘেরাও হল। দারোয়ান ও চাকরেরা উঠে ভেতরে খবর দিল।

জয়ন্ত বসু চোখ কচলাতে কচলাতে বেরিয়ে এল।

"ব্যাপার কি দারোগা সায়েব?" সে বলল, তারপর আমায় দেখে হেসে বলল, "এই যে—প্রবীর মজুমদারের ছায়াও এসেছেন দেখছি—"

ইন্‌স্পেক্টর দত্ত বললেন, "দয়া করে জামাকাপড় পরে আস্থন জয়ন্তবাবু—সাবধান, পালাবেন না—বাড়ী ঘেরাও করেছি আমরা—"

"তার মানে—হোয়াট ডু ইউ মীন?" জয়ন্ত বসু ভুরু কুঁচকে বলল।

"আই মীন টু এ্যারেস্ট ইউ জয়ন্তবাবু—"

"কেন? কি বলছেন আপনি? কি করেছি আমি? জয়ন্ত বসু চমকে উঠল।

"প্রবীর মজুমদারকে খুন করিয়েছেন অর্থাৎ খুন করেছেন—"

"মিথ্যে কথা—প্রবীর আমার বন্ধু—" জয়ন্ত চেঁচিয়ে উঠল।

"বন্ধুরাও হত্যা করে জয়ন্তবাবু—" ইন্‌স্পেক্টর দত্ত বললেন।

জয়ন্ত বসু হঠাৎ দরজার দিকে তাকাল, কি যেন দেখতে পেয়ে হঠাৎ সে ফ্যাকাশে হয়ে গেল, ভয়ে বিকৃত গলায় উচ্চারণ করল, "মল্লিকা!"

আমি চমকে উঠলাম মল্লিকার নাম শুনে। জয়ন্ত বসু মল্লিকার নাম নিচ্ছে কেন?

"কার সঙ্গে কথা বলছেন মশাই?" মিঃ দত্ত প্রশ্ন করলেন।

জয়ন্ত বসু দরজার দিকে তাকিয়ে থেকেই হঠাৎ বসে পড়ল, কান্নার মত গলা করে টেনে টেনে একটি সম্মোহিত ব্যক্তির মত বলতে শুরু করল, "বলছি, বলছি আমি—হ্যাঁ, আমিই দায়ী—আমি প্রবীরের বৌ রমাকে ভালবেসেছিলাম—তার বিয়ের আগে থেকেই। কিন্তু

রমা আমায় চাইত না। প্রবীরের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেলে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম—যে ভাবেই হোক রমাকে আমায় পেতেই হবে। তাই প্রবীর মজুমদারের সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব করলাম, প্রবীরকে দেখার ছল করে রমাকেই দেখতে যেতাম আমি। প্রবীরকে আমিই নিত্য নূতন মেয়ের সন্ধান দিয়ে চরিত্রহীনতার নরকে একটু একটু করে ঠেলে দিতে লাগলাম যাতে রমা তাকে ঘৃণা করে, ঘৃণা করে প্রবীরকে ডাইভোর্স করে। কিন্তু যখন কিছুতেই তা হল না, যখন প্রবীরের চরিত্রহীনতা সত্ত্বেও রমা আমায় আমল দিল না তখন ভাবলাম যে প্রবীর মজুমদার মারা গেলে হয়ত আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে। তাই আমি বিনোদকে পাঠাই। প্রবীর মারা গেল, তারপর থেকে দু'বছর ধরে আমি নতুন উদ্যমে রমার কাছে যাচ্ছি, আবেদন জানাচ্ছি। হয়ত একদিন রমাকে আমি পেতেও পারতাম কিন্তু এমনি সময়ে এল শান্তনু রায়—প্রবীর মজুমদারের প্রেত—সে আসার পর থেকেই রমা যেন ক্রমেই রুক্ষ হয়ে উঠল এবং আমি মরীয়া হয়ে উঠতে লাগলাম। বিনোদ পুরোন লোক, সে প্রতি মাসেই আমার কাছ থেকে টাকা পেত। শান্তনু রায়কে এ পৃথিবী থেকে সরাবার জন্য আমি তাকে হুকুম দিলাম আর পুলিশে বেনামী চিঠি দিলাম যে শান্তনু রায়ই প্রবীরের হত্যাকারী—তারপর, তারপর আর আমার কিছু বলার নেই—"

বলতে বলতে সোফাটার ওপর লুটিয়ে পড়ে জয়ন্ত বসু কেঁদে উঠল। একটা আহত পশুর মত।

। দশ ।

প্রবীর মজুমদারের হত্যার মীমাংসা হল। বিচারে জয়ন্তর কি হবে তা তো ভবিষ্যতের গর্ভে। আপাতত আমি নিরাপদ, আমি নিশ্চিন্ত। গল্পের 'ক্লাইম্যাক্স' প্রায় শেষ হয়ে এল ভরত।

পরদিন আমি সারাদিন ধরে ঘুমোলাম। বিকেলে ঘুম ভাঙার

পর দেখলাম যে রমা চা নিয়ে ঘরে ঢুকছে।

"আপনার খুব কষ্ট গেছে কাল না?" রমা হেসে বলল। কিন্তু তবু যেন কেমন সুদূর তার ভাব। আর সেই একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা।

চা শেষ হবার আগেই রমা চলে গেল। আমি স্বচ্ছন্দ বোধ করলাম সে যাওয়াতে। সে কাছে এলেই আমার যেন কি হয়! আমার আর এক মন আমার মনকে প্রলুব্ধ করতে থাকে। রমা যেতেই মল্লিকার কথা মনে পড়ল আমার। আমি জামাকাপড় বদলে খানিক বাদেই বেরিয়ে পড়লাম। আকাশে একটু একটু মেঘ দেখলাম। আর হাওয়া বইছে জোরে।

বালীগঞ্জের ট্রামডিপোতে নেমে স্টেশনের দিকে এগোতেই দেখি মল্লিকা আসছে। বাতাসে সেই গন্ধ।

"একি, কোথায় চললে?" আমি অবাক হয়ে বললাম।

"কোথাও না—ভাবলাম ট্রাম স্টপে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, আপনার সঙ্গে দেখা হবে—"

"হঠাৎ এ খেয়াল কেন?"

"এখন বাড়ীতে নয়, চলুন গঙ্গার ঘাটে যাই—"

"হয়ত বৃষ্টি আসবে—বাড়ীই তো ভাল—"

"না, না, গঙ্গার ঘাটে চলুন, খুব ভালো লাগবে—"

"মানে 'তোমার' ভালো লাগবে—"

"হ্যাঁ, আমার ভালো লাগবে—"

"বেশ—চল—"

চড়লাম ট্যাক্সিতে। পাশাপাশি বসলাম। মল্লিকার দেহসৌরভে আমার চেতনায় স্তিমিত একটি ঝড়ের বাজনা শুরু হল।

মল্লিকা বলল, "এবার বলুন—কাল কি হল?"

বললাম সব কথা।

মল্লিকা শুনে বলল, "ভগবান—ভগবান—"

"ভগবান কি?"

"ভগবান আছেন—"

"কিন্তু জয়ন্ত হঠাৎ তোমার নাম কেন নিল তা তো বুঝলাম না মল্লিকা—"

"না বোঝার কি আছে—জয়ন্তদার বিবেকে জমা ছিল যে সে আমার ক্ষতি করেছে—তাই—"

"কিন্তু মল্লিকা, তুমি বিনোদ সাহা এদের কথা কি করে জানতে পেরেছিলে ?"

"ওসব কথা এখন বলতে পারব না—ভালো লাগছে না ওসব কথা বলতে—তার চেয়ে অন্য কথা বলুন—"

"কি কথা ?"

"যে কোন কথা—শহরে কোন্ সিনেমাটা এখন খুব চলছে কিংবা সোনার দর—"

"সোনা এখন কালো বাজারে, ওকথা থাক—সিনেম' দেখবে ?"

"না—গঙ্গার হাওয়া খাব—" মল্লিকা হাসল।

গঙ্গার ঘাটে পৌঁছোলাম। একটা নির্জন অংশে গিয়ে বসলাম। হঠাৎ কেন যেন কথা হারিয়ে গেল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার চরাচর ছেয়ে ফেলেছে। দূরে নৌকোগুলো দুলছে, তাদের লণ্ঠনের আলো দুলছে। দূরে বড় বড় জাহাজের আলোগুলো দুলছে। সমস্ত আলো গিয়ে পড়েছে ভরা গঙ্গার বুকে। আকাশে তখন মেঘ ঘন হয়ে উঠছে। হাওয়ার বেগ বাড়ছে। কেমন এক উদাসি সুর গঙ্গার জলকল্লোলে।

"শুনুন—"

"বল মল্লিকা—"

"সেদিন বার বার পেছন ফিরে আমায় কেন দেখছিলেন বলুন তো—সেই যে—আপনার অফিসের সামনে ?"

"পাছে তুমি হারিয়ে যাও সেই ভয়ে—"

"বটে! আমি হারিয়ে গেলেই বা ?"

"না না—তোমাকে আমি হারাতে পারব না মল্লিকা—"

"কিন্তু হারিয়ে তো একদিন যেতেই হয় শান্তনুবাবু—"

"তুমি মৃত্যুর কথা বলছ ?"

"হ্যাঁ—"

"মৃত্যু কি জানি না – কিন্তু আমার আজকাল মাঝে মাঝে মরতে ইচ্ছে হয় মল্লিকা—"

"সত্যি ?"

"হ্যাঁ। মনে হয় মৃত্যুও একটা সত্য, দেখি না তা পরখ করে—"

"মৃত্যু সত্য বৈকি, মৃত্যু একটা রূপান্তর—"

"কেন ? মৃত্যু কি শেষ নয় ?"

"কোনো কিছুই এ বিশ্বে শেষ হয় না শান্তনুবাবু—এখানে সব কিছুই চিরকাল আছে, চিরকাল থাকবে—"

"তাই কি ? আমি, শান্তনু রায়, চিরকাল থাকব ?"

"আপনি আর শান্তনু রায় তো এক নন—আপনি থাকবেন ঠিকই, শান্তনু তো পোশাক—"

"তুমিও চিরকাল থাকবে ?"

"আমিও থাকব, হয়ত ভবিষ্যতে শ্যামলী কিংবা মার্গারেট হব—"

"তাহলে প্রেম কি শাশ্বত নয় মল্লিকা ?"

"প্রেম শাশ্বত কিন্তু ক'জন পায় তাকে ? শাশ্বত প্রেমের নামই রাধাকৃষ্ণ। তার খোঁজেই তো জীবনের চাকায় আটকে দিনের পর দিন ঘুরছি আমরা—এক জীবন থেকে আর এক জীবনে—খুঁজি, কিন্তু পাই না। যেমন আমি চেয়েছিলাম কিন্তু পেলাম না—"

মল্লিকা, না চাইলেও তো পাওয়া যায়—"

"কিন্তু না চাইলে পেয়ে তৃপ্তি কোথায় ? প্রেম উভয়ত না হলে তা শুধুই অনুরাগ। আদানপ্রদান না হলে অনুরাগ প্রেম হয় না। প্রেম দ্বৈত-সংগীত।"

মাথার ওপরে মেঘ ডাকল। গুরু গুরু গুরু।

আমি হঠাৎ মল্লিকার একটি হাত টেনে বললাম, "মল্লিকা, তুমি পরশুদিন আমার কথা শেষ হতে দাওনি—পরে বলতে বলেছিলে—"

মল্লিকার হাতটা আমার হাতে কেঁপে উঠল। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাতটা,

কিন্তু কী আশ্চর্য কোমল। সেই কোমলতা আমার শরীরে এক বিচিত্র উত্তাপের সৃষ্টি করতে লাগল। কিন্তু সে উত্তাপে দাহ নেই।

"বলল মল্লিকা--"

"বেশ তো বলে ফেলুন—"

"আমি তোমায় ভালবাসি মল্লিকা—মল্লি—"

মল্লিকা ধীরে ধীরে তার হাতটি টেনে মুক্ত করে নিল, বলল, "আপনি জানেন যে আমি প্রবীর মজুমদারকে ভালবাসতাম, তবু?"

"আমি জানি যে তুমি এখন আর তাকে ভালবাসো না—"

"তা ঠিক—কিন্তু আমি প্রবীর মজুমদারের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছিলাম তা জেনেও আপনি এসব কথা বলতে পারছেন?"

"পারছি—তুমি আমাকে সমস্ত সংস্কারের ওপরে তুলে নিয়েছ মল্লিকা—"

"কিন্তু সংস্কার মানা উচিত শান্তনুবাবু—ভালো সংস্কারের নামই সুনীতি—"

"সুনীতি এ ক্ষেত্রে বাধা দিচ্ছে না মল্লিকা—"

"চলুন, একটা নৌকোয় চড়ে বেড়াই শান্তনুবাবু—" মল্লিকা কথার মোড় ফেরাল।

"আমায় জবাব দিলে না মল্লিকা—"

মল্লিকা তাকাল, তার দু'চোখের তারায় জ্যোতি যেন ম্লান হয়ে এল, বলল, "একটা ভুলের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে যে সময় লাগে শান্তনুবাবু—"

একটা করুণ আবেদন ছিল মল্লিকার গলায়, তার চোখের তারায়। আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিঃশব্দে মাথা নাড়লাম। মল্লিকা তাকিয়েই রইল আমার দিকে।

"কি দেখছ মল্লিকা?

"আপনাকে দেখছি। আপনি সুন্দর—"

"কিন্তু আমি যে প্রবীর মজুমদারের মত দেখতে—"

"আমি যে এখন আর বাইরের রূপ দেখা বন্ধ করে দিয়েছি

শান্তনুবাবু—আমি দেখছি আপনার ভেতরের রূপটা যা প্রবীর মজুমদার অনেক জীবনের তপস্যার ফলেও পাবে না।”

“কিন্তু তা সত্বেও প্রবীর মজুমদারের প্রেমে সবাই পড়ত কেন?”

“মানে মেয়েরা? মেয়েরা যে পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী সরল, নির্বোধ—”

“আমরা তো জানি মেয়েরা বড় জটিল—”

“না, সাধারণ মেয়েরা খোঁজে পৌরুষ ও সৌন্দর্যের একটা প্রকাশ তাই চটপটে, সুদর্শন ও বাক্‌পটু কিংবা শক্তিমান পুরুষের দিকে সে সহজেই আকৃষ্ট হয়—তারপর সে সরল বলেই, তার পুরুষ অন্যরকম জানার পরেও তার সঙ্গ সহজে ছাড়ে না। যারা ছাড়ে তারা আসলে ভালবাসাকেই ভালবাসে, সেই পুরুষকে নয়। কিংবা তারা ভালবাসলে শুধু পুরুষদের বহিরঙ্গতেই মুগ্ধ হয় না, তাদের অন্তরের রূপটিকে, তাদের অন্তরের আসল পুরুষদের রূপটিকে দেখে মুগ্ধ হলেই ভাল-বাসায় পড়ে। এইসব মেয়েরা অসাধারণ।”

মল্লিকা উঠে দাঁড়াল, হেসে বলল, “আমিও অসাধারণ মেয়ে শান্তনুবাবু, আমি এতদিন শুধু ভালবাসাকেই ভালবেসে ছিলাম যা সাধারণ মেয়েরা সাধারণত শেষ বয়সে করে থাকে—”

“তার মানে?” আমিও উঠে দাঁড়ালাম।

“তার মানে সাধারণ মেয়েরা ভালবাসে বা বিয়ে করে, কিন্তু কিছু-দিন বাদেই যখন নেশাটা ফিকে হয়ে আসে আর নিজেদের স্বামীস্ত্রীর মধ্যবর্তী দুস্তর ব্যবধানটাকে যখন দুর্লজ্ঘ্য বলে বুঝতে পারে, তখন তারা স্বামীকে বা প্রিয়তমকে আর ভালবাসতে পারে না, অথচ বাঁচতে তো হবে এবং সবাই পাপ করতে পারে না কিংবা তাদের পুরুষদের পরিত্যাগ করতেও পারে না, তাই তারা ভালবাসাকে ভালবেসে বাঁচবার চেষ্টা করে—”

“তোমার এত বুদ্ধি এই বয়সে হল কি করে মল্লিকা?”

“বয়স আমার কম হল নাকি? তাছাড়া এ তো বুদ্ধির কথা নয়, এ তো মেয়েদের কথা, মেয়ে হিসেবে আমার উপলব্ধির কথা, আমার

ব্যর্থতা দিয়ে নিজেকে বুঝতে পারা—"

"বুঝেচি, কিন্তু মল্লিকা, অসাধারণ মেয়েরা কি পরে একটি সাধারণ মেয়ে হতে পারে না ?"

"হয়ত পারে—আপাতত একটা নৌকোয় চড়ান দেখি—" মল্লিকা আবার কথার মোড় ফেরাতে চেষ্টা করল।

হেসে নীচে নেমে গেলাম। একটা নৌকা ভাড়া করলাম। আধ ঘণ্টা ঘোরাবে, পাঁচ টাকা দেব।

নৌকো ভাসল। আমরা দু'জনে ছইয়ের কাছে পাশাপাশি বসলাম। ছোট নৌকো, দু'জন মাঝি। দুলে দুলে গভীরতর জলের দিকে নৌকো এগিয়ে চলল। আমরা চুপ করে দাঁড় ও বৈঠার শব্দ, জলের স্রোতের শব্দ, নৌকোর গায়ে ঢেউয়ের আঘাতের শব্দ শুনতে লাগলাম। দূরের কোনো একটা জাহাজের বাঁশীর শব্দ ভেসে এল—গঙ্গার বুকের ওপর দিয়ে সেই শব্দ যেন চারদিকে প্রতিহত হয়ে ভাসতে ভাসতে দূরে মিলিয়ে গেল। আকাশে মেঘ ডেকে উঠল। মনে হল আকাশ মেঘে মেঘে নিরন্ধ্র হয়ে উঠেছে। মেঘের ডাকে গঙ্গা যেন একটি ময়ূরের মত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, ফুলে উঠল, দুলে উঠল, নেচে উঠল। আর অমোদের ছোট্ট নৌকাটি অশান্ত হয়ে উঠল।

আমি বললাম, "যদি নৌকো ডুবে যায় মল্লিকা ?"

মল্লিকা হাসল, বলল, "এমনি পাশাপাশি বসে আমরা ডুবব।"

"ডুবলে কি হবে ?"

"মরব।"

"মরলে কি হবে ?"

"একটা অধ্যায় শেষ হবে, একটা রূপ শেষ হবে, একটা ভূমিকার শেষ হবে।"

"মৃত্যুর পর আমরা কোথায় যাব ?"

"এই পৃথিবীতেই থাকব—শুধু আরো ওপরে—শূন্যতায়, আলোতে, অন্ধকারে, অদৃশ্য বীজের মত গর্ভের আধার খুঁজব নতুন রূপের জন্য, নতুন ভূমিকার জন্য, নতুন নাটকের জন্য—"

"মৃত্যু কি ভয়ঙ্কর ?"

"তা শুধু মরেই জানা যায় শান্তনুবাবু—"

"মৃত্যুর কী দরকার মল্লিকা ?"

"রূপের স্বাদ পাবার জন্য, ভালবাসার স্বাদ পাবার জন্য—তার জন্যেই তো অহরহ লয় থেকে সৃষ্টি হচ্ছে—"

"তাহলে আবার লয় হয় কেন ?

"সৃষ্টির আনন্দকে বারবার ভোগ করার জন্য।"

"তাহলে শাস্ত্রে ত্যাগের কথা বলে কেন ?"

"ত্যাগ স্রষ্টার আনন্দকে উপলব্ধি করা যায়—"

"মল্লিকা, তুমি কি আমায় ভালবাসবে না ?"

"আমায় ভালবেসে আপনি সুখী হবেন ?"

"হ্যাঁ মল্লিকা—হ্যাঁ মল্লি, তোমায় পাবার জন্য যদি মরতে হয় তাহলে আমি তাতেও রাজী—"

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাল। তার আলোতে মুহূর্তের জন্য মনে হল যে মল্লিকার চোখেও বিদ্যুৎ চমকাল।

সে বলল, "সত্যি ? না শুধুই কথা ?"

"সত্যি—সত্যি মল্লিকা—"

"তাহলে আসুন আমরা মরি—"

সঙ্গে সঙ্গে নৌকোটা যেন কাৎ হয়ে গেল, একটা বড় ঢেউ এসে আমাদের ঠেলে জলে ফেলে দিল। মাঝিদের চীৎকার শোনা গেল, দূরে কাদের কোলাহল শোনা গেল। আমরা ডুবলাম। নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে জল ঢুকল, দুরন্ত স্রোত আমায় টেনে নিয়ে চলল আর একটি লতার মত মল্লিকা আমায় জড়িয়ে ধরে ক্রমেই যেন অজগরের মত ভয়ানক হয়ে উঠল, তার বাহুবন্ধনের নাগপাশে আমায় বন্দী করে পাতালের দিকে টেনে নিয়ে চলল। আমি জ্ঞান হারালাম।

তারপর হঠাৎ যেন কানের কাছে কারো ক্ষীণ শব্দ শুনলাম, "শান্তনু—শান্তনু—" শব্দটা ক্রমেই পরিষ্কার হল, "শান্তনু—প্রিয়তম—"

আমি চিনতে পারলাম। মল্লিকা আমায় ডাকছে, সে আমায় 'প্রিয়তম' বলে ডাকছে! আমি চোখ মেললাম, চৈতন্যের জগতে ফিরে এলাম, লয় থেকে সৃষ্টিতে এলাম। দেখলাম আমি গঙ্গার ঘাটের কিনারায় পড়ে আছি আর আমার মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে মল্লিকার মুখ।

"মল্লিকা—"

"শান্তনু—"

"আমি কি বেঁচে আছি?"

"হ্যাঁ, তুমি বেঁচেই আছ, তুমি না মরেই আমায় পেলে।"

আমি উঠে বসলাম, দু'হাতে তার মুখ তুলে ধরে তার ঠোঁটে চুমু খেলাম। বিদ্যুৎ চমকাল। মনে হল মল্লিকা একটি বিদ্যুতের শিখা। মনে হল মল্লিকা একরাশ ফুল। মনে হল মল্লিকা একরাশ তূলো। মনে হল মল্লিকা স্বপ্ন।

"ছাড়ো—শীত করছে—"

ছাড়লাম। মনে হল অমৃতের স্বাদ আমার ঠোঁটে।

"শিগ্‌গীর বাড়ী চলো—" মল্লিকা বলল।

সেই ভিজে জামাকাপড় নিয়েই ট্যাক্সিতে চড়ে কসবায় ফিরলাম। ট্যাক্সি গেল পুকুরের ধার পর্যন্ত। ট্যাক্সি থেকে সেই টাকমাথা ফুলুরিওয়ালাকে আজো একা একা ফুলুরি ভাজতে দেখলাম। মল্লিকাদের বাড়ী অন্ধকার মনে হল। বললাম, "আমার পকেটে কিছুই নেই, সব গঙ্গার স্রোত টেনে নিয়ে গেছে।"

মল্লিকা বলল, "দাঁড়াও তুমি, আমি বাড়ী থেকে নিয়ে আসছি—"

আমি ট্যাক্সির পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। মল্লিকা গিয়ে দরজা খুলে ভেতরে গেল। ঘরের ভেতর আলো জ্বলে উঠল।

মল্লিকা বেরিয়ে এল, ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিল। ট্যাক্সি চলে গেল।

মল্লিকা ডাকল, "এসো—"

আমি বললাম, "তোমার মা বাবা—"

"ওঁরা নেই, তারকেশ্বর গেছেন—"

"কিন্তু চাবি? তা মা গঙ্গা ছেড়ে দিলেন কি করে?"

"চাবি এখানেই ছিল, বলব না কোথায়, যদি কোনো এক সময়ে চুরি করে নিয়ে যাও—" মল্লিকা হাসল।

আমিও হেসে বললাম, "সে ভয় সত্যি আছে কিন্তু—"

আমরা ভেতরে ঢুকলাম। মল্লিকা দরজা বন্ধ করে বলল, "জামা-কাপড় ছেড়ে নাও, ঠাণ্ডা না লাগলে বাঁচি—"

বললাম, "তুমি ভেবো না মল্লিকা—আমি একাধারে স্যাণ্ডো ও ভীমভবানী—"

"বটে, তাদের বুঝি ঠাণ্ডা লাগত না?"

"তাতো তাদের জিজ্ঞেস করে দেখিনি—"

মল্লিকা খিলখিল করে হেসে উঠল। যেন একপাল হরিণ শিশু দৌড়ে পালাল। যেন ঝর্ণা বয়ে গেল। যেন একটা সেতারের সবগুলো তার আচমকা ঝঙ্কার তুলল।

আমি কাপড়জামা বদলে বাইরের ঘরে এলাম। মল্লিকাও ততক্ষণে শুকনো কাপড় পরেছে। সে আমার খাবার এনে দিল। মুড়ির মোয়া, পাতলা রুটি আর আলুপেঁয়াজের তরকারি। তারপর চা।

"বোস—আমি রান্নাঘরটা গুছিয়ে আসি—"

"তুমি খেলে না?"

"আমার খিদে নেই।"

"গঙ্গায় ডুবেও না?"

"ডুবেছি বলেই নেই।" বলে মল্লিকা হাসতে হাসতে ভেতরে চলে গেল।

আমি বসে বসে দেয়াল-আলমারি থেকে বই টেনে টেনে দেখতে লাগলাম। অনেকক্ষণ বাদে খেয়াল হল মল্লিকা বড় দেরী করছে। ডাকলাম তার নাম ধরে কিন্তু সাড়া পেলাম না। কয়েকবার ডেকে সাড়া না পেয়ে আমি ভেতরে গেলাম। দেখলাম অন্ধকার।

"মল্লিকা—" আমি ডাকলাম।

কোনো সাড়া পেলাম না।

"মল্লিকা—"

কেউ সাড়া দিল না। কি ব্যাপার? আমি বাইরের ঘরের ল্যাম্পটা হাতে করে ভেতরের একটা ঘয়ে উঁকি মারলাম। কেউ নেই ঘরে। তার বিপরীতে অন্য ঘরটা। সে ঘরে ঢুকলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গেই খিলখিল হাসি শুনতে পেলাম। ঘুরে দেখি দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে মল্লিকা। কী আশ্চর্য সুন্দরী সে! কি অদ্ভুত সুন্দর তার চুলের রাশি! তার চোখে যেন আকাশের তারা। গজদন্তের মীনারের মত গ্রীবাদেশ। প্রবাল-রক্তিম ঠোঁট। দুটি ভীরু পারাবতের মত যুগলস্তন। ক্ষীণ কটি। সুগঠিত উরুযুগল। নিতম্বের পরিমিত প্রাচুর্য।

আমি বললাম, "দুষ্টুমী হচ্ছিল?"

"হুঁ—"

"কেন?"

"হুঁ—"

"তুমি বড় সুন্দর মল্লিকা—"

"হুঁ—"

"মল্লিকা, তুমি কি বাস্তব?"

"হুঁ—"

"না না, তুমি অবাস্তব, তুমি মায়া, তুমি কায়াহীন ছায়া—"

"হুঁ—"

"মল্লিকা, আজ বেঁচেছি, কিন্তু আমি তো চিরকাল বাঁচতে পারব না—"

"উঁ হুঁ—"

"সময় নেই মল্লি, সময় রকেটবেগে ধাবমান—"

"অতএব—"

"হুঁ—"

"মল্লি-রাক্ষসী—" আমি ল্যাম্প হাতে এগোলাম মল্লিকার দিকে, তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। হাতের কাছেই একটা ছোট্ট টেবিল, তার ওপর ল্যাম্পটা রেখে তাকালাম তার মুখের দিকে। মল্লিকার দু'চোখে কি ভালবাসার ভীরু বাসনার সজল আভাস ?

হঠাৎ দমকা বাতাস এল। বাতাসে মল্লিকার তীব্র দেহসৌরভ ভেসে এল। বাতাসে ল্যাম্পটা একবার দপ্ করে উঠেই নিভে গেল : আমি একটা হাত বাড়িয়ে মল্লিকাকে স্পর্শ করলাম, সে দু'হাত বাড়িয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরল, আমার বুকে মিশে গিয়ে আমার মুখের দিকে মুখ নিয়ে এল।

"মল্লিকা—"

"বল—'

"এ রাত যেন শেষ না হয়—"

"চাই না তবু শেষ হবে—"

"শেষ হবেই ?"

"শেষ হবে শুরু হবার জন্য, শুরু হবে শেষ হবার জন্য।"

"আবার মরতে ইচ্ছে করে মল্লি—"

"না না—আর ওকথা বোলো না—তোমায় বাঁচতে হবে—এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব অনুপরমাণু রূপধারণ করে বাঁচার জন্য আকুল আর তুমি চাইছ মরতে ! না না, আর ওকথা বোলো না—"

"মল্লি, একটা কথা—"

"বল—"

"তোমার সেই সন্তান ?"

"সে নেই—সে আকাশে, বাতাসে, আলোতে, আমার বেদনা ও আনন্দে, সে এখন তোমাতে—"

মল্লি, আমি তোমায় ভালবাসি—"

"প্রিয়তম—"

অন্ধকারে আমি ফুলের আর ফলের স্বাদ পেলাম, পাখীর পালকের

স্পর্শ পেলাম, পেলাম এক রোমাঞ্চকর উত্তাপের উষ্ণতা। তৃপ্তির ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে এল।

তারপর কখন জোর বৃষ্টি হয়েছে, কখন বৃষ্টি থেমেছে, তা মনে নেই। হঠাৎ বায়ুবেগে জানালাটা খটখট শব্দ করে উঠল আর আমার তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল।

"এই—শান্ত—অশান্ত—"

"মল্লি—"

"ওঠ—এবার যাও—ভোর হয়ে আসছে—"

"যেতেই হবে ?"

"হ্যাঁ—নইলে লোকে কী বলবে—ছিঃ—"

"বাতিটা জ্বালো, তোমায় দেখি—"

"না না—আর সময় নেই—ওঠ, দোহাই তোমার—"

"এই অন্ধকারেই যাব ?"

"হ্যাঁ—ভাবছ কেন ? আবার আলোতে দেখা হবে—এখন থেকে তো তোমাকেই খুঁজব গো জন্ম জন্মান্তরে, তোমাকে পাবার জন্যই আমার যাত্রা শুরু হল—"

"আর আমি ?"

"তুমি পেয়ে গেছ—এবার এসো, আর দেরী নয়—"

"আবার কাল দেখা হবে ? তোমার গান শুনব, নাচ দেখব—"

"না কাল নয়—"

"তবে কবে ?"

"বলতে পারছি না—যখনি পারব তখনি আসব—এখন তুমি যাও—"

"চলি—"

"এসো—"

আমি বেরিয়ে এলাম। চোখে ঘুমের রেশ তখনো। বিচিত্র এক নেশায় পা টলমল।

হাঁটতে হাঁটতে এগোলাম। আশ্চর্য, এই শেষরাতেও সেই

টাকমাথা লোকটি মাথা নীচু করে ফুলুরি ভেজে চলেছে! না, সময় নেই ওর সঙ্গে কথা বলার। তাছাড়া আমায় কেউ দেখলে হয়ত মল্লিকার ক্ষতি হবে। আমি থামলাম না, এগিয়ে গেলাম।

ভোরবেলায় বাড়ী ফিরে আমি মিথ্যে কথা বললাম মিসেস মজুমদারকে। বললাম যে আমি আমার বন্ধু অমিয় চৌধুরীর বাড়ীতেই রাতে ছিলাম। রমার চোখে দেখলাম সন্দেহ। মনে হল সে বিশ্বাস করেনি।

সেদিন অফিসে গেলাম। সারাদিন গতরাতের কথা আমায় আচ্ছন্ন করে রইল। আবার কবে? কাল? যদি মল্লিকা কথা না রাখে?

সন্ধ্যেবেলা বাড়ী ফিরলাম।

মিসেস মজুমদার সেদিন সারাক্ষণ বসে রইলেন আমার ঘরে। তিনি বেছে বেছে সেদিন নানা রেকর্ড শোনালেন। আমার যেটি ভাল লাগে সেটিই শুনলাম প্রবীর মজুমদারেরও ভালো লাগত। সে রাতে বিশেষ বিশেষ খাবারও দেখলাম টেবিলে। বিশেষ আয়োজন।

"কেমন লাগছে বাবা?"

"চমৎকার—"

"এই রান্নাগুলো প্রবীরের বড় প্রিয় ছিল।"

সেদিন রাতে তাড়াতাড়ি ঘুম এল। 'মায়া-কুঞ্জে' সেই আমার শেষ রাত। শেষ দৃশ্য।

হঠাৎ ঘুমের ঘোরে মনে হল যেন দরজা খুলে গেল। মনে হল কেউ এগিয়ে আসছে। শাড়ীর খস্ খস্ শব্দ। আমি উঠে বসলাম।

"কে?"

জবাব পেলাম না। আমি টেবিলল্যাম্পের সুইচ টিপলাম, দেখলাম যে ঘরের মধ্যে রমা দাঁড়িয়ে। রাজেন্দ্রানী যেন স্বর্গের অপ্সরী সেজে এসেছে।

"আপনি!"

"হ্যাঁ—এই ভাবেই তো আমি আসতাম তোমার কাছে—"

"আমার কাছে ?"

আমি তাকালাম, দেখলাম যে দুটো ঘরের মধ্যবর্তী সেই দরজা খোলা।

"ও দরজার তালা কে খুলেছে ?"

"আমি—"

"কেন ?"

"তোমার কাছে আসব বলে—"

"আপনি যান—"

"না।"

"আমি মিসেস মজুমদারকে ডাকব তাহলে—"

"ওই তালার চাবি মা নিজের হাতে আমায় দিয়েছেন—"

"আপনি দয়া করে যান—"

"না, আমি আমার স্ত্রীর অধিকার চাই—"

আমি বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালাম। আমার ঘাম হতে লাগল। মৃদু আলোকে এই বাসনাময়ী মূর্তি আমায় বিপন্ন করে তুলছে।

বললাম, "আপনি তো জানেন আমি আপনার স্বামী নই—"

"তুমিই আমার স্বামী—আমি এতদিন ভাণ করেছি যে তুমি আলাদা লোক, আমি বিশ্বাস করতেও চেয়েছি যে আমার স্বামী খুন হয়েছেন কিন্তু প্রতিপদে আমি তোমায় লক্ষ্য করেছি—তুমি আলাদা লোক নও। তা যদি হত তাহলে প্রতিটি ব্যাপারে মিলে যেত না। আশ্চর্য—"

"কিন্তু জয়ন্ত বসুর কথা আপনি শোনেননি ?"

"শুনেছি—খুন হয়েছে—তোমার মত দেখতে আর কেউ—তুমি এতদিন সব ভুলে ছিলে—আজ তোমায় ভালবেসে আমি সব মনে পড়িয়ে দেব—"

হঠাৎ মনে পড়ল। জয়ন্ত বসু বলেছিল আমি প্রবীর মজুমদারের প্রেত। কথাটা যেন ঠিকই মনে হল।

রমা এগিয়ে এল কাছে। তার বুক উত্তেজনায় উঠানামা করছে।

উত্তেজক একটা এসেন্সের গন্ধ পাচ্ছি। একটু ঘোর লাগছে। আম পিছোলাম। রমা সুন্দরী, লাস্যময়ী। আমি ভুল না করে বসি।

"না—তুমি আমায় আজ ঠেলে দিও না। আর আমি বাধা দেব না, তোমার যেখানে ইচ্ছে যাও, আর আমি ঝগড়া করব না। বেশ, আমি কাঞ্চীকে কালই ডেকে আনব। তবু নড়ছ না, তবু রাগ করছ! বেশ তুমি শান্তনু। শান্তনু, তুমি প্রবীর হয়ে আমায় বাঁচাও—'

হঠাৎ দমকা হাওয়া এল জানালা দিয়ে। স্নিগ্ধ হাওয়া। সঙ্গে সেই অজানা ফুলের সুবাস। যেন মল্লিকা এল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল যে মিসেস মজুমদার যেন আজকের রাতের এই ঘটনার জন্যই আমায় এই বাড়ীতে নিয়ে আসার জন্য সব রকম চেষ্টা করেছেন। কি সাংঘাতিক কথা!

হঠাৎ ছুটে গেলাম, দরজা খুলে বেরিয়ে গেলাম আমি।

পেছন থেকে রমা চেঁচাল, "যেয়ো না—যেয়ো না—"

কিন্তু আমি থামলাম না। এই কাহিনীর আজ শেষ হোক। আর আমি প্রবীর মজুমদারের প্রেত হয়ে থাকব না। আমি শান্তনু রায়, আলাদা মানুষ, আমার আলাদা জগৎ। আমি মল্লিকাকে ভালবাসি।

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলাম। মিকি গর্জাল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আমি বাগানের ভেতর দিয়ে ছুটলাম।

গুর্খা হাঁকল, "কৌন্ হ্যায়?" আমি ফিরে তাকালাম না। পাঁচিল টপকে গলিতে পড়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করলাম। আর পাগলামো নয়, এবার এই অস্বাভাবিক গল্পের শেষ হোক!

আমি সোজা অমিয় চৌধুরী, আমার পাটনার সেই বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। অমিয় অবাক। সে জিজ্ঞেস করল যে ব্যাপার কি। আমি বললাম যে পরে সে সব কথা জানতে পাবে, আপাতত আমার কাপড়জামা থেকে খাওয়াদাওয়া সব রকম দায়িত্ব তাকে নিতে হবে

দিন সাত আটের জন্য। অমিয় বলল, "এ আবার একটা কথা ?"

বসে বসে ভাবলাম। আর কোন সংস্রব রাখব না 'মায়া-কুঞ্জে'র সঙ্গে। ওবাড়ীর আবহাওয়ায় অসুস্থতা। মিসেস মজুমদার পর্যন্ত অসুস্থ এই কথা ভাবতে কেমন যেন খারাপ লাগল। কিন্তু খারাপ লাগলেও কথাটা সত্যি। ঠিক করলাম যে মল্লিকার সঙ্গে দেখা করে, পরামর্শ করে আমি পাটনায় যাব ও বাবার মত সংগ্রহ করব বিয়ের জন্য। তারপরে অন্য একটা চাকরি জোগাড় করব। না, আর ও চাকরি নয়। ও চাকরি তো মিসেস মজুমদারের দেওয়া।

আমার আর তর সইছিল না। আমি দুপুরে খেয়েই কসবার দিকে গেলাম। শ্রীধর মুখুজ্জে রোডে পা দিয়ে ভাবলাম যে এখন সেই টাঁকমাথা নিশ্চয় ঘুমুচ্ছে, নইলে এখন ফুলুরি কে খাবে ?

হঠাৎ খুব হালকা মনে হল। আমি যেন এতদিন একটা অসুস্থতার ঘোরে ছিলাম। সেই ঘোর কেটে গেছে। অথচ আমি লাভ করেই বেরিয়ে এসেছি। লাভ করেছি একটি কাহিনী আর একটি প্রিয়তমা।

কিন্তু রাস্তাটা ধরে ঠিকই যাচ্ছি তো! হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম। এইতো সেই বটগাছটা, যার পাশে সেই টাকমাথার দোকান। কিন্তু কোথায় দোকানটা ? দেখছি না তো! একটু এগোলাম। হ্যাঁ, পুকুরও তো রয়েছে। তাহলে রাতারাতি দোকানপাট ভেঙ্গেচুরে কোথায় নিয়ে গেল! পুকুরের উত্তর দিকে একটা বাড়ী আছে, সেই বাড়ীটাই বটে কিন্তু এমন ইঁট বের করা, আগাছায় ভর্তি কেন ? একটা দেয়াল এক জায়গায় ভেঙ্গে গেছে দেখছি! এর অর্থ কি ? এটা কি আলাদা বাড়ী ? না তো, শিউলিগাছটা তো বাইরে ঠিকই আছে। আমি এগিয়ে গেলাম। দেখলাম যে বাইরের দরজায় একটা লালচে জংধরা তালা ঝুলছে। চোখ কচলে দেখলাম। না, ঠিকই দেখছি। এবাড়ী এখন বাসযোগ্য নয়। তাহলে ? তাহলে কি ?

আমি ফিরে চললাম। কিছুদূর এগিয়ে সেই মুদির দোকানটা পেলাম যেখানে একদিন একজনের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। লোকটি বলেছিল, ওদিকে আর যাবেন না, জায়গাটা ভাল নয়—

জিজ্ঞেস করলাম তাকে, "দাদা, ন'য়ের বাই নয় নম্বর বাড়ীটা কি ওদিকে—"

মুদি তাকাল, ভুরু কুঁচকে বলল, "আপনি আর একদিন এসেছিলেন—না ?"

"তা ঠিক—

"ন'য়ের ন[illegible] তো কেউ থাকেন না।"

"এঁ্যা !"

"হ্যাঁ—এককালে থাকতেন শিবনাথ মিত্র—"

আমি সাগ্রহে বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ—"

মুদি বলল, "তাঁর মেয়েটি দুবছর আগে বিষ খেয়ে মারা যায়, তাঁর পেটে একটি বাচ্চা তখন—"

আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলাম, "বিষ খেয়েছে !"

"হ্যাঁ, দুঃখের কথা আর বলবেন না। মেয়েটি এমনিতে খুব ভালো ছিল, তবে ভালোরাও তো ভুল করে, হ্যাঁ দাদা ?"

"আজ্ঞে—" আমার মাথা ঘুরছে।

"সেই ইস্তক বুড়ো-বুড়ী কেমন যেন হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন ওরা উধাও হল বাড়ী তালাবন্ধ করে। নানাজনে নানা কথা বলেছে। পরে শোনা গেল যে বুড়ী বৃন্দাবনে মারা যায়, তারপর বুড়োর খোঁজ আর কেউ পায়নি—"

"কিন্তু—কিন্তু আমি যে মল্লিকাকে দেখলাম—পরশুও তো—"

মুদি আমার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল।

আমি প্রশ্ন করলাম, "ঐ বটগাছের পাশে একটা ফুলুরির দোকান ছিল—সেটা আজ কোথায় গেল ?"

মুদি ভুরু কুঁচকে বলল, "কোথায় থাকেন ?"

'এই কাছাকাছি—"

'হুঁ—কিন্তু খবর রাখেন না। সে দোকানওতো দেড় বছর আগে উঠে গেছে—দোকানদার নিজের ভাজা ফুলুরি খেয়েই কলেরাতে মারা গেছে।"

আমি বোকার মত তাকিয়ে রইলাম। তারপর হঠাৎ সবেগে চলতে আরম্ভ করলাম।

"কি হল দাদা? এ্যা—অ মশাই?"

আমি আবার গেলাম পুকুরের ধারে। না, বাড়ীটা পোড়ো হয়েই আছে। সেই তালাটা ঝুলছে। তার পরে যমুনা নাম্নী মল্লিকার সেই এক বান্ধবীকে খুঁজে বার করলাম। সে-ও একই কথা বলল। পাড়ার দুচারজনকে জিজ্ঞেস করেও ওই একই জবাব পেলাম। মল্লিকা আত্মহত্যা করেছে। দু'বছর আগে। বিষ খেয়ে। তার পেটে একটি তিনমাসের সন্তান ছিল। আমি বিশ্বাস করতে চাইলাম না কিছুই, তবু যেন অবিশ্বাস করতেও পারছিলাম না।

এমনি মনের অবস্থা নিয়ে আমি অমিয়দের বাড়ীতে ফিরতেই তার চাকর একটি চিঠি দিল হাতে, বলল যে একটি বাচ্চা এসে এই খামটা দিয়ে গেছে।

আমি খুলে দেখলাম, চমকে উঠলাম। মেয়েলি হাতের লেখার নীচে মল্লিকার সই। লিখেছে:

শ্রীচরণেষু,

এতক্ষণে তো সব রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে। আমি সত্যি তোমাদের মত বেঁচে নেই। আমি দু'বছর আগেই আত্মহত্যা করে মরেছি? সঙ্গে আমার তিনমাসের অপরিণত শিশুটি। প্রবীর মজুমদারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণা ও আক্রোশ নিয়ে মরেছিলাম, তাই মৃত্যুলোকে অপেক্ষা করছিলাম প্রতিশোধ নেব বলে। কিন্তু এই লোকেও ভুল হয়। তাই তুমি মজুমদার-বাড়ীতে আসার পরই যেন আমি প্রবীর মজুমদারকে খুঁজে পেলাম। প্রতিহিংসার কামনায় এই লোকের দূরদৃষ্টিও আমার আচ্ছন্ন হয়ে ছিল তাই তোমাকে একদিন আমাদের বাড়ীর পেছনকার চোরাবালিতে নিয়ে মারবার চেষ্টা করা পর্যন্ত বুঝতে পারিনি যে তুমি আসলে প্রবীর নও। যখন বুঝলাম, তখন তোমায় বাঁচালাম। তোমায় বাঁচিয়ে পরে মুগ্ধ হলাম। ভালবাসলাম। ভালবেসে ভাবলাম তোমায়

এই লোকে নিয়ে আসি। তাই তুমিও মরতে চাইতে অত। তাই একদিন নৌকো ডুবিয়ে তোমায় মারবার চেষ্টাও করলাম। কিন্তু তোমাকে অতল জলের দিকে নিয়ে যেতে যেতে উপলব্ধি করলাম যে আমার ভালবাসা তোমার মৃত্যুতে ছোট হয়ে যাবে—তাই তোমাকে বাঁচিয়ে তোমাকে আরো ভালবাসলাম। তুমিও ভালবাসলে। জীবনে যে ভালবাসা আমি পাইনি, তা মরবার পর আমি এতদিনে পেলাম। হয়ত তোমার সঙ্গে আরো দেখা হত—যতদিন তোমার ভ্রান্তি মায়াকেই সত্য ভাবত। কিন্তু আর তা সম্ভব নয়।

আর আমি আসতে পারব না। আর তুমি আমায় খুঁজো না। কিন্তু তুমি আমাকে ভুলেও যেয়ো না। বাতাসের সঙ্গে ফুলের গন্ধ হয়ে আমি তোমার আশেপাশে মাঝে মাঝে ঘুরে যাব—তোমার জন্য আবার রূপ আর দেহর প্রার্থনা করব। কবে তোমায় পাব জানি না, তবে তোমাকে পাওয়ার সাধনাই আমার শুরু হল। একদিন না একদিন, কোনো না কোনো জন্মে আমি তোমার পাশে এসে জীবন্ত হয়ে দাঁড়াবই। বিদায়।

—তোমারই মল্লিকা

চিঠি পড়লাম, দেখলাম। হ্যাঁ, হাতের লেখা আছে। মিথ্যা নয়। গোটা গোটা, মেয়েলি হাতের লেখা। কিন্তু এ কী করে সম্ভব?

আবার বেরোলাম। ছুটলাম কসবায়। না, সেই বাড়ী তেমনি তালাবন্ধ। সবাই একই কথার পুনরাবৃত্তি করল, আমায় ভূতগ্রস্ত ভাবল। আমি বাড়ী ফিরলাম। সে রাতে যে জামাকাপড় বদলেছিলাম সেগুলো দেখলাম। আমার নয় সেগুলো। আবার ছুটলাম কসবায়। এমনি দিনের পর দিন। আমার চেহারা কেমন যেন হয়ে গেল। আমি বাতাসে সেই অজানা ফুলের গন্ধ পাবার জন্য মাঝে মাঝে জোরে জোরে যেখানে সেখানে নিশ্বাস টানতাম। অমিয় কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছিল আর চিন্তিত হয়ে উঠেছিল। সে একদিন জোর করে আমায় নিয়ে পাটনার ট্রেনে উঠে বসল। আমি

বাবার কাছে ফিরে গেলাম। হয়ত জায়গা-বদল হওয়ার ফল ফলল। মাসখানেক পরে আমি স্বাভাবিক হলাম। তার কিছুদিন পরে এই ওষুধের কোম্পানীর চাকরি নিয়ে আমি মাদ্রাজ চলে গেলাম। তারপর ঘুরতে ঘুরতে এতদিন বাদে কলকাতায়। কিন্তু চাকরি পেতেই আমি দাড়ি রাখতে শুরু করেছি যাতে আর কেউ কোনদিন ভুল না করে, ভুলে প্রবীর মজুমদার ভেবে আবার নতুন কোনো কাহিনীর বিপজ্জনক স্রোতে আমায় না টেনে নিয়ে যায়। এই কলকাতায় ঘুরে বেড়াই, কিন্তু থ্যাঙ্ক গড, আর কোনো ঘটনা ঘটেনি। ঘটলেও আমি আর কাহিনীর সন্ধানে নেই বলে বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারব। এখন মাঝে মাঝে হাসি পায়, মনে হয় সবই বুঝি দুঃস্বপ্ন। কিন্তু মল্লিকা—সেই চিঠি তো মিথ্যে নয়, ভোজবাজি নয়! তা আছে আমার কাছে। মৃত্যুলোক কেমন জায়গা জানি না, আর আমার মরতেও ইচ্ছে হয় না, তবু—যদি জানতাম যে সেখানে মল্লিকা এখনো আছে, যদি সেই লোকে গিয়ে বেড়িয়ে আসার কোনো ব্যবস্থা থাকত তাহলে মল্লিকাকে দেখার জন্য আমি নিশ্চয়ই যেতাম। বিয়ের কথা বলছিস, আমার বোধ হয় এ জীবনে আর ওটি হবে না। গঙ্গার অতল থেকে ফিরে এসে সেই রাতে মল্লিকার বাড়ীতে আমার যে বিয়ে হয়েছিল সেকথা আমি এ জীবনে আর ভুলতে পারব না।